ফকিহ- এর নিরঙ্কুশ

শাসন- কর্তৃত্ব

জিজ্ঞাসা ও জবাব

মূলঃ আলী শীরাযী

অনুবাদঃ নূর হোসেন মজিদী

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে আমাদের সমাজে বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে এ বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তির ব্যাপারে বিশেষ জিজ্ঞাসা ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। এ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাবে জানা যায় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন- কর্তৃত্বের আক্বিদাহ্ পোষণের কারণেই কোনোরূপ দলীয় সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াই ইরানে এ বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে যখন জানা যায় যে, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) ইরাকের নাজাফে নির্বাসিত জীবন যাপন কালে "বেলায়াতে ফকীহ্" শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তখন এ ধারণা অধিকতর শক্তিশালী হয়।

এ তথ্যের সাথে দু'টি ধারণা প্রসূত ব্যাখ্যা যুক্ত হয়ে যায়। একটি ধারণা এই যে, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের উদগাতা; যদিও তিনি ইসলামী সূত্র থেকে উপাদান নিয়ে এ তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, তবে তার আগে বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন- কর্তৃত্বের বিষয়টির প্রতি কারোই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। এ ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে একটি বড় কারণ এই যে, ইমাম খোমেনীর আগে কেউই গায়রে ফকিহের শাসনকে অবৈধ গণ্য করে তার অবসান ঘটানো ও তদস্থলে ফকিহের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে তোলেন নি এবং সে লক্ষ্যে বিপ্লব ঘটাবার উদ্যোগ নেন নি। দ্বিতীয়তঃ ধারণা করা হয় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব শিয়া মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল; আহলে সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। বলা হয় যে, শিয়া মাযহাবের ইমামতের আক্বিদাহর কারণে শিয়াদের মধ্যে দল- উর্ধ ধর্মীয় নেতার প্রতি যে আনুগত্য গড়ে উঠেছে আহলে সুন্নাতের মধ্যে তা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য যে, দুটো ধারণাই প্রকৃত অবস্থা থেকে বেশ দূরে। বেলায়াতে ফকীহ্ হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) কর্তৃক উদ্ভাবিত কোনো তত্ত্ব নয়, যদিও তিনি এ ধারণাকে অনেক শানিত করেছেন। বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসনের বিষয়টি ইসলামে সব সময়ই ছিলো। বিশেষ করে সকল যুগেই শিয়া মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে অতীতে এর রাজনৈতিক দিকটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো; বাস্তবে রূপায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় নি; তেমনি তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতিও তৈরী হয় নি। (স্মর্তব্য, বেলায়াতে ফকীহ্ কেবল রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয় নয়, বরং সর্বাত্মক দ্বীনী নেতৃত্বের বিষয়।) হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেলায়াতে ফকীহর ধারণাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ বেলায়াতে ফকীহ্ শিয়া মাযহাবের কোনো একান্ত বিষয় নয়, বরং এটা শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। প্রকৃত পক্ষে শিয়াদের পূর্বেই সুন্নীদের জন্য বেলায়াতে ফকীহ্ তথা উপযুক্ততম দ্বীনি নেতা ও শাসকের অপরিহার্যতা দেখা দেয়। কারণ, শিয়া মাযহাবের ইমামতের আক্বিদাহর দাবী অনুযায়ী সর্বশেষ ইমামের জনসমাজের আড়ালে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইমাম ব্যতীত কোনো 'উপযুক্ততম দ্বীনী নেতা ও শাসকের' অপরিহার্যতা দেখা দেয় নি। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মাঝে ইমামতের আক্বিদাহ্ না থাকার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরামের (সা.) ইন্তেকালের পর পরই মুসলিম উম্মাহর জন্য 'উপযুক্ততম দ্বীনি নেতা ও শাসকের' অপরিহার্যতা দেখা দেয়। কারণ, তাত্ত্বিকভাবে 'উপযুক্ততম দ্বীনী নেতা ও শাসক' ব্যতীত কেউই আল্লাহর রাসূলের (সা.) স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না। এখানে কেউ কেউ হয়তো ছাহাবীগণ, তাবে'ঈন ও তাবে' তাবে'ঈন- কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করার কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাত্ত্বিকভাবে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ, তারা ছিলেন একটি সীমিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যদিও তাদের মধ্যকার উপযুক্ততম ব্যক্তিগণকে 'উপযুক্ততম দ্বীনি নেতা ও

শাসক' হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য করতে বাধা নেই। (অবশ্য ব্যক্তি হিসেবে উপযুক্ততম ব্যক্তি কে তা এক স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়।)

"আল- 'উলামাউ ওয়ারাছাতুল্ আম্বিয়া" (আলেমগণ নবী- রাসূলগণের উত্তরাধিকারী) - এ হাদীছটি শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের সূত্রে বর্ণিত এমন একটি হাদীছ যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কখনোই বিতর্ক সৃষ্টি হয় নি এবং বিচারবুদ্ধিও এর প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে। মূলতঃ বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন- কর্তৃত্বের তত্ত্ব এ হাদীছেই নিহিত। পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাতের মনীষীগণ শাসকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আহলুল হাল্লি ওয়াল্ 'আক্বদ্ তথা দ্বীনি বিষয়ে মতামত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকগণ কর্তৃক শাসক নির্বাচনের কথা বলেছেন যা বর্তমান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশেষজ্ঞ পরিষদের প্রায় সমার্থক। তবে উক্ত হাদীছ ও বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী যদিও আহলে সুন্নাতের মধ্যে "সর্বোত্তম চরিত্রের দূরদর্শী ও সুপরিচালক আলেমে দ্বীনই হবেন মুসলমানদের শাসক এবং তার পরিবর্তে গায়রে আলেমের শাসন- কর্তৃত্বের বৈধতা নেই" - এ মর্মে আক্বিদাহ্ গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু কার্যতঃ বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করার কারণে এ আক্বিদাহ্ গড়ে ওঠে নি। বিলম্বে হলেও, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে অন্ততঃ এ দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা- পর্যালোচনা ছাড়াই এটিকে ইমাম খোমেইনীর (রহঃ) উদ্ভাবন ও শিয়া মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে অভিহিত করে একে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

যা- ই হোক, এখনো এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। এ ব্যাপারে বক্ষ্যমাণ অনুবাদগ্রন্থটি উৎসাহ সৃষ্টির কারণ হবে বলে আশা করা যায়। প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত অত্র সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন প্রশ্নে উদ্ভূত সর্বশেষ সংশয়মূলক প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ইসলামী হুকুমাতের বিরোধী শক্তির বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ প্রভাবেই এসব প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এসব প্রশ্নের জবাব থেকে বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের নিকট বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত ধারণা অনেকখানি

সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করি। সেই সাথে আরো আশা করি যে, এ থেকে বাংলাভাষী ইসলামী মহল সমূহ, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন সম্পর্কে আলোচনা- পর্যালোচনা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হবেন এবং সমাজের জন্য ফকীহ্ ও ফকীহ্ শাসকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ইজতিহাদী শিক্ষাও যোগ করবেন(এ ক্ষেত্রে তারা শিয়াদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারেন)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, আমাদের সমাজে দ্বীনী মহল সমূহের মধ্যকার অন্তর্বিরোধ, বিশেষতঃ গৌণ বিষয়াদি কেন্দ্রিক অন্তর্বিরোধের জন্য ইজতিহাদী শিক্ষা ও মুজতাহিদের উপস্থিতি না থাকাই প্রধান কারণ।

অনুবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে কয়েকটি বিষয়ের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা ও কিছু মনীষী সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা প্রদান জরুরী গণ্য করেছি এবং তা অন্ত্যটীকা আকারে সংযোজন করেছি। আশা করি টীকাগুলো পাঠক-পাঠিকাদেরদেরকে উপকৃত করবে।

অত্র গ্রন্থের অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদেরকে আলোচ্য বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিতে এবং এ বিষয়ে চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলেই অনুবাদকের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র গ্রন্থের রচনা, অনুবাদ, প্রকাশ, প্রচার, অধ্যয়ন ও আলোচনা- পর্যালোচনাকে তার দ্বীনের খেদমত হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

নূর হোসেন মজিদী

ঢাকা

১৬ই সফর ১৪৩০

১লা ফাল্গুন ১৪১৫

১৩ই ফেব্র"য়ারী ২০০৯।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘বেলায়াতে ফাক্বীহ্’ (ولایت فقیه - ফকীহ্ বা ফকীহর বেলায়াত) পরিভাষায় ‘বেলায়াত্’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘কর্তৃত্ব’ বা ‘অভিভাবকত্ব’। এ কর্তৃত্ব হচ্ছে শরয়ী আইন- কানুন ও বিধি- বিধানগত কর্তৃত্ব (ولایت تشریعی)। অর্থাৎ খোদায়ী আইন- কানুন ও বিধিবিধানের সীমারেখার মধ্যে শাসনকর্তৃত্ব।

অন্যদিকে বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়ক আলোচনায় ‘ফাক্বীহ্’ (فقیه) পরিভাষার মানে হচ্ছে সকল শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ। এ ধরনের মুজতাহিদ তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। তা হচ্ছে: তাকে পরিপূর্ণভাবে ইজতিহাদী দক্ষতার অধিকারী হতে হবে, চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে তাকে নিরঙ্কুশ ন্যায়ানুগতা তথা ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে এবং তার মধ্যে পরিচালনা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকতে হবে। এ দৃষ্টিতে সকল মুজতাহিদই ফকিহ নন, বরং শুধুমাত্র উপরি উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুজতাহিদই ফকিহ বলে গণ্য।

বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন- কর্তৃত্বের মানে হচ্ছে ইসলামী সমাজের শাসন ও পরিচালনায় তার কর্তৃত্ব, যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে দ্বীনী হুকুম- আহকাম কার্যকর করণ ও দ্বীনী মূল্যবোধ সমূহের বাস্তবায়ন এবং সমাজের সদস্যদের প্রতিভা ও সম্ভাবনা সমূহকে বিকশিত করণ, আর তাদেরকে তাদের প্রতিভা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী পূর্ণতা ও সমুন্নতিতে পৌঁছে দেয়া।

ঠিক এ কারণেই ইসলামের দুশমনরা ফকীহর নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বেলায়াতে ফকীহ্ তথা ফকিহ নেতা ও শাসকের বিরোধিতা এবং তাকে দুর্বল করার মাধ্যমে তাদের নিজেদের আধিপত্যের পথ উন্মুক্ত করা।

এ ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম অপকৌশল হচ্ছে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সন্দেহ- সংশয়ের বিস্তার ঘটানো। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে যদি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গভীর ও নির্ভুল হয় তাহলে তারা কখনোই কারো সৃষ্ট সন্দেহ- সংশয়ের কারণে দোদুল্যমান হয়ে পড়বে না। এ ধরনের সন্দেহ- সংশয় নিরসনের অমোঘ মহৌষধ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লোকদের জ্ঞানের স্তর বিবেচনা করে তদনুযায়ী তাদেরকে ঐ সব প্রশ্নের নির্ভুল ও যুক্তিসঙ্গত জবাব প্রদান।

এ কারণেই, বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকিহর শাসন- কর্তৃত্ব এবং সেই সাথে ফকিহ শাসককে চিহ্নিতকরণ ও জনগণের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ পরিষদ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর জবাব দান ও সৃষ্ট সন্দেহ- সংশয়ের নিরসনের লক্ষ্যে স্বীয় সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে অত্র পুস্তক রচনা করেছি যাতে সমকালীন জিজ্ঞাসা সমূহের অন্ততঃ অংশবিশেষের হলেও জবাব দিতে পারি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি সম্মানিত পাঠক- পাঠিকাদের সুদৃষ্টি, প্রস্তাব ও সহযোগিতায় তাকে পূর্ণতা প্রদান করা সম্ভব হবে।

এ পুস্তক রচনার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টির ওপরে জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা এবং এ ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীন ও আল্লাহর ওলীগণের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। আমি এখানে এ বিষয়ে প্রধানতঃ ইসলামী বিপ্লবের পথিকৃৎ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর দৃষ্টিকোণের প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। কারণ, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহর ওলীগণ ও অতীত কালের প্রাজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বরং হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সততা ও দৃঢ়তার সাথে এবং ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

এ কারণেই আজকের দুনিয়ায় বেলায়াতে ফকীহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের দুশমনরাও বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার মাত্রা তীব্রতর করেছে। তাই তারা এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বস্তুতঃ

বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের বিরোধিতা করা বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্যতম উপসর্গে পরিণত হয়েছে।

এভাবে ইসলামী সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বেলায়াতে ফকীহর বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত সর্বাত্মক হামলা চলছে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে মোকাবিলা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এটা আমাদের সকলেরই দ্বীনী দায়িত্ব। এ কারণে আমরা এ ব্যাপারে সৃষ্ট সমকালীন সন্দেহ-সংশয় নিরসনের লক্ষ্যে কলম হাতে তুলে নিয়েছি। এর লক্ষ্য সম্মানিত পাঠক- পাঠিকাদেরকে এ ব্যাপারে আরো গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই সাথে ইসলামের দুশমনদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, আমরা তাদের যে কোনো অপকৌশলের মোকাবিলায় এবং যে কোনো বিভ্রান্তির নিরসনে সক্ষম; আমরা কখনোই বেলায়াতে ফকীহকে তাদের হামলার মুখে একা ফেলে রাখবো না, বরং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার হেফাযতের লক্ষ্যে বেলায়াতে ফকীহর পৃষ্ঠপোষকতা করবো।

আলী শীরাযী

ফকিহের নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফকিহের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের তাৎপর্য কী?

উত্তরঃ পারিভাষিক অর্থে 'বেলায়াত্' (ولايت) মানে হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর কারো অভিভাবকত্ব বা শাসন- কর্তৃত্ব। প্রকৃত পক্ষে বেলায়াত হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনো ব্যপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বা তার মতামত বাস্তবায়ন।

দ্বীনী জ্ঞানের পরিভাষায় 'ফকীহ্' (فقيه) হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং ইসলামী হুকুমাতের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও পরিপূর্ণরূপে অবহিত। এছাড়া তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হচ্ছে এই যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং আত্মিক, নৈতিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নত অবস্থানের অধিকারী; তার সত্তায় এমন কতক গুণাবলী স্থায়ীভাবে নিহিত যা তাকে গুনাহ্ ও নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং এর ফলে তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকেন। এ ধরনের উন্নত ও লক্ষণীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে সমন্বিতভাবে 'ইদালাত্ (عدالت - ভারসাম্যতা, নীতিনিষ্ঠতা, ন্যায়ানুগতা) বলা হয়।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন ফিক্বাহাত্ (فقاهت - দ্বীনী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞত্ব ও দ্বীনী যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানের যোগ্যতা) ও 'ইদালাত্ থাকে অর্থাৎ একই সাথে দ্বীনী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পাণ্ডিত্ব ও তা অনুসরণের ক্ষেত্রে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তৈরী হয়ে যায় এবং সেই সাথে তার মধ্যে সমাজ পরিচালনার জন্যেও যথেষ্ট যোগ্যতা তৈরী হয়ে যায়, তখন তিনি বেলায়াতের অধিকারী হন।

'বেলায়াত্' পরিভাষাটি যখন 'ফাক্বীহ্' পরিভাষার সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ পরিভাষা হিসেবে 'বেলায়াতে ফাক্বীহ্' বলা হয়, তখন তার মানে হয় সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপর ফকিহর শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। বস্তুতঃ যে কোনো সমাজের জন্যই বৃহত্তর ও সামষ্টিক বিষয়াদি

পরিচালনার জন্য উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারী শাসক ও কর্তৃত্বশালীর প্রয়োজন হয়, ইসলামী সমাজে যে ধরনের গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শাসক ও পরিচালকের প্রয়োজন পারিভাষিকভাবে তাকে বেলায়াতে ফকীহ্ বলা হয়।

আর এ শাসন- কর্তৃত্ব 'নিরঙ্কুশ' হওয়ার মানে হচ্ছে এই যে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সব ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রয়োজন তিনি পূর্ণ মাত্রায় তার অধিকারী হবেন।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ফকিহর নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্ব মানে হচ্ছে ফকিহ শাসক এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী এবং 'ইলম, তাক্ওয়া ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় মা'ছূমগণের (আ.) অধিকতর নিকটবর্তী ও হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। এরূপ ব্যক্তি সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মা'ছূমগণের (আ.) সমস্ত এখতিয়ারের অধিকারী হবেন এবং তার অনুমতি ব্যতীত কোনো আইনই কার্যকারিতা ও বৈধতার অধিকারী হবে না। তার অনুমতি ব্যতীত কেউই আইন বাস্তবায়নের অনুমতি পাবে না। বরং রাষ্ট্রের সকল কাজকর্মই তার অনুমতি সাপেক্ষে সম্পাদিত হবে।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) 'ফকীহ্ শাসকের বিভিন্ন দিক ও এখতিয়ার সমূহ' (شؤون و اختيارات ولى فقيه) গ্রন্থের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের (আল্লাহর আইনের জ্ঞান ও 'ইদালাত) অধিকারী কোনো সুযোগ্য ব্যক্তি যদি উত্থিত হন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন সে ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কর্তৃত্বের (বেলায়াত) অধিকারী ছিলেন, তিনি সেই একই কর্তৃত্বের অধিকারী এবং সকল জনগণের জন্য তার আনুগত্য করা অপরিহার্য।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৪০ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর হুকুমাতী এখতিয়ার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.)- এর হুকুমাতী এখতিয়ারের চেয়ে বেশী ছিলো বা হযরত আলী (আ.)- এর হুকুমাতী এখতিয়ার ফকীহর হুকুমাতী এখতিয়ারের চেয়ে বেশী ছিলো - এরূপ ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর বাণী ও বক্তব্যের সংকলন 'ছাহীফায়ে নূর'- এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫১৯ নং পৃষ্ঠায় তার যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে এ বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে হযরত ইমাম বলেনঃ "যদিও আমার দৃষ্টিতে এটা (ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান) কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে যা বলা হয়েছে ইসলামে ওলামায়ে কেরামের এখতিয়ার তার চেয়েও বেশী; মূলতঃ এই বুদ্ধিজীবীরা যাতে বিরোধিতা না করে সে লক্ষ্যে মহোদয়গণ এ ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিয়েছেন। এ সংবিধানে যা উল্লিখিত হয়েছে তা বেলায়াতে ফকীহর কতক দিক মাত্র, সকল দিক নয়। .... এত সব শর্ত সহকারে যে এটি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তার সবই একটি বিষয়ের শর্তাবলী - যা তারা অত্যন্ত ভালোভাবে নির্ধারণ করেছেন; আমরাও এটা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বিষয় এটা নয়, বরং বিষয়টি এর চেয়েও অনেক বড়।"

ফকীহ্ বা মুজতাহিদের নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বের তাৎপর্য এটাই। ফকীহ্ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সেই হুকুমাতী এখতিয়ারের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মনোনীত নবী ও ইমামগণ (আ.) নবুওয়াত ও ইমামতের আসনে বসে যে সব সুনির্দিষ্ট এখতিয়ারের অধিকারী, ফকীহ্ ইসলামী সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সেই অভিন্ন এখতিয়ারের অধিকারী।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার আল- বাই' (البيع - ক্রয়- বিক্রয়/ ব্যবসায়) গ্রন্থে বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেনঃ "রাষ্ট্র ও নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের এখতিয়ার হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও ইমামগণের (আ.) জন্য প্রযোজ্য, তার সবই 'আদেল (ন্যায়বান ও ভারসাম্যের অধিকারী) ফকীহর জন্য প্রযোজ্য এবং বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এতদুভয়ের এখতিয়ারের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করা সম্ভব নয়।"

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমামের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহগণ মা'ছূমগণের (আ.) পক্ষ থেকে

শরয়ী, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের অধিকারী এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত অবস্থায় থাকার যুগে সকল বিষয়ই তাদের ওপর অর্পিত।"

স্বয়ং মা'ছূমগণ (আ.) ফকীহদের এই বেলায়াত বা শাসন- কর্তৃত্বের অধিকারকে 'নিরঙ্কুশ' বলেছেন। অতএব, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহদের নিকট থেকে এ বৈশিষ্ট্যকে, বরং এ এখতিয়ারকে ফিরিয়ে নেয়া তারা (মা'ছূমগণ) ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে যে সব ত্রুটি ছিলো ১৩৬৮ ফার্সী সালে (১৯৮৯ খৃস্টাব্দে) হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর নির্দেশে সংবিধান পর্যালোচনা পরিষদ কর্তৃক তা দূরীভূত করা হয় এবং এ সংশোধনীতে সংবিধানের ৫৭ নং ধারার 'নির্দেশ দানের কর্তৃত্ব' (ولایت امر) সংশোধন করে তদস্থলে 'নির্দেশ দানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব' (ولایت مطلق امر) লেখা হয়। সংবিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও সম্পূরণ ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটে ইরানী জনগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এর ফলে তখন থেকে কার্যতঃ 'নির্দেশ দানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব' (ولایت مطلق امر) আইনগত রূপ পরিগ্রহণ করে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের এ মূলনীতিটি সংবিধানের ১১০ নং ধারাকে প্রভাবিত করে। সংবিধানের ৫৭ নং ধারা অনুযায়ী ফকীহ শাসকের শাসন- কর্তৃত্ব হচ্ছে নিরঙ্কুশ। অতএব, সংবিধানের ১১০ নং ধারায় যে ফকীহ শাসকের ১১টি এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে সে কারণে তার পুরো শাসন- কর্তৃত্ব এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বুঝায় না। বলা বাহুল্য যে, যে কোনো সীমাবদ্ধতাই তার বিরোধিতার তাৎপর্য বহন করে, কিন্তু সংবিধানের ৫৭ নং ধারা হচ্ছে নিরঙ্কুশ।

অতএব, শরীয়ত, বিচারবুদ্ধি ও সংবিধানের দৃষ্টিতে আমরা ফকীহ্ বা ফকীহ শাসকের নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বে বিশ্বাসী। আমাদের মহান মরহূম ইমামও ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ বা বিচারবুদ্ধি ও শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে বলেনঃ "নবী ও ইমামগণের (আ.) জন্য যত রকমের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক দায়িত্ব নির্ধারিত আছে তার সবই 'আদেল ফকীহর জন্য নির্ধারিত।"

এর ভিত্তিতেই আমরা মনে করি,ফকীহ শাসকের অনুমোদন ব্যতীত কোনো আইন- কানুনই বৈধতা ও কার্যকরিতার অধিকারী নয় এবং সমগ্র রাষ্ট্রীয় কাজকর্মই তার অনুমতিক্রমে পরিচালিত হয়।[১] এমনকি জনগণের রায়ও কেবল তখনি মূল্যবান হয় যখন তা মুজতাহিদ ফকীহ্ কর্তৃক অনুমোদিত হয়[২] ,তা সে মুজতাহিদ ফকীহ্ হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) হোন,অথবা হযরত আয়াতুল্লাহ্ 'উযমা সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীই হোন - এতে কোনোই পার্থক্য নেই।

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের নবম খণ্ডের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার যদি ফকীহ শাসকের অনুমতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত না হয় বা ফকীহ শাসকের দ্বারা মনোনীত না হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বা ক্ষমতায় আরোহণ করে, তাহলে তা তাগূত।"

অতএব ফকীহ শাসক কর্তৃক নিয়োজিত না হয়ে থাকলে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টও একজন তাগূত।

বস্তুতঃ ফকীহ শাসক হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সকল রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের অধিকারী হবেন। প্রকৃত পক্ষে ফকীহ শাসকের হুকুমাত হচ্ছে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বেরই একটি শাখা মাত্র, আর তার শাসন- কর্তৃত্ব ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের হুকুম সমূহের [৩] অন্যতম হিসেবে পরিগণিত - যা সমস্ত শাখা- প্রশাখাগত আহকামের ওপর, এমনকি নামায, রোযা ও হজ্বের ওপর অগ্রাধিকার রাখে। যেখানেই ইসলামী সমাজের কল্যাণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে সেখানেই তিনি শরীয়ত ও ইসলামী মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে তার শাসন- কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবেন। বস্তুতঃ ফকিহ শাসকের অবস্থান সকল রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ও কাজকর্মের ওপরে এবং সকল কাজই তার অনুমতিক্রমে ও তার অনুমতির ছায়াতলে বৈধতা লাভ করে।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "ফকীহগণ হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর দ্বিতীয় স্তরের অছি এবং হযরত রাসূলে

আকরাম (সা.)- এর পক্ষ থেকে ইমামগণের (আ.) ওপর যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা তাদের জন্যও কার্যকর হবে। অতএব, তাদেরকে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সকল কাজকর্মই সম্পাদন করতে হবে।"

আমরা এই প্রকৃত অবস্থাকেই ফকীহর নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্ব হিসেবে গণ্য করি। আমরা মনে করি, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর দীর্ঘ কালীন অন্তর্ধানের যুগে [৪] ফকীহ্ শাসক হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) ন্যায় জনগণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও হস্তক্ষেপের অধিকারী।

ফকীহ্ শাসক কি নির্বাচিত নাকি মনোনীত?

জবাবঃ ফকীহ শাসকের হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্বের মূলনীতিটির শরয়ী ভিত্তি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। যেহেতু ফকীহ্ শাসক হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন, সেহেতু তার নিয়োগও কোনো না কোনোভাবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে বা তার অনুমতিক্রমে হওয়া প্রয়োজন। তবে ফকীহর হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্ব বাস্তব রূপ লাভের বিষয়টি জনগণ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার শর্তাধীন।[৫]

ইসলামী দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি, সমগ্র সৃষ্টিলোক তথা মানুষ সহ এ সমগ্র বিশজগতের অস্তিত্বলাভের পিছনে নিহিত মূল কারণ হচ্ছেন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তিনিই এ বিশ্বলোক ও এর অভ্যন্তরে নিহিত সব কিছুর প্রকৃত মালিক। তাই সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও দাস। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, আমাদের সত্তার কোনো অংশই আমাদের নিজেদের নয়; আমাদের পুরো অস্তিত্বই তার মালিকানাধীন। এটা অনস্বীকার্য যে, কোনো সম্পদে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা যুলুম বৈ নয়। এর ভিত্তিতে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিৎ যে, কোনো মানুষেরই তার মালিক আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তার নিজের বা অন্যদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

বলা বাহুল্য যে, কতগুলো কাজ রাষ্ট্রশক্তির সাথে অনিবার্য ও অপরিহার্যভাবে জড়িত। যেমনঃ বৈধ প্রয়োজনে কাউকে গ্রেফতার করা, কারাগারে নিক্ষেপ করা, জরিমানা করা, কর আদায় করা, হত্যা করা, মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা, বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপ করণ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির আচরণে, কাজকর্মে ও জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করণ। অতএব, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে এভাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য শাসককে অবশ্যই মানুষের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে অনুমতির অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় তার সমস্ত হস্তক্ষেপই হবে অবৈধ, জুলুম ও জবরদস্তি মূলক। এটাই বিচারবুদ্ধির রায়। বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসন-

কর্তৃত্ব মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহকে এ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তার আইনানুগ বৈধতার ভিত্তিও হচ্ছে এই মনোনয়ন - যা আল্লাহ্ তা'আলা ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়েছে।

ওমর বিন হানযালাহ্ বর্ণিত মাক্বুলাহ হাদিসটি(যে হাদিসের বর্ণনাধারার শেষ বর্ণনাকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী বা ইমাম হতে বর্ণনা করেছেন তার বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি স্বরূপ নবী বা ইমাম হতে কিছু বর্ণিত হয়নি অবশ্য তারা তাকে কখনও মিথ্যাবাদীও বলেননি; এ হাদিসের বর্ণনাকারী ওমর বিন হানযালাহর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে অর্থাৎ তার বিশ্বস্ততার বিষয়টি অজ্ঞাত) এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। ফকীহগণের অনেকেই বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব প্রমাণের জন্য এর সপক্ষে দলীল হিসেবে উক্ত রেওয়ায়েতটির উল্লেখ করেছেন। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)ও তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। উক্ত রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেনঃ "তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আমাদের হাদীছ বর্ণনা করবে (অর্থাৎ হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে হাদীসটি আদৌ নবী বা ইমামদের থেকে বর্ণিত কিনা যাচাই করতে পারবে) , হালাল ও হারামের প্রতি দৃষ্টি রাখবে (এ ক্ষেত্রে মতামত দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী হবে) এবং আমাদের আহকামের সাথে পুরোপুরি পরিচিত থাকবে, তোমরা তাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করো। অবশ্যই জেনো যে, আমি তাকে তোমাদের ওপর শাসক ও বিচারক নিয়োগ করলাম (فانى قد جعلته عليكم حاكماً)। অতএব, সে যখন কোনো আদেশ দেয় তখন যারা তা গ্রহণ না করে তারা আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করলো এবং আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহকেই প্রত্যাখ্যান করলো, আর আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরক করার সমতুল্য।"

এখানে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ফকীহগণ ও ওলামায়ে দ্বীনের কথা বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর শাসক ও বিচারক নিয়োগ করেছেন এবং তিনি

ফকীহগণের রায়কে তার নিজেরই রায় বলে গণ্য করেছেন। আর বলা বাহুল্য যে, মা'ছূম ইমাম (আ.)- এর আদেশের আনুগত্য অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব, ফকীহর আদেশের আনুগত্য করাও অপরিহার্য কর্তব্য এবং ফকীহর শাসন- কর্তৃত্ব অমান্য করা বড় ধরনের গুনাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরক করার সম পর্যায়ভুক্ত।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "তিনি [ইমাম জাফর সাদিক (আ.)] এরশাদ করেছেনঃ فانى قد جعلته عليكم حاكماً - অর্থাৎ এ ধরনের শর্তাবলী বিশিষ্ট কাউকে যখন আমি তোমাদের ওপর শাসক নিয়োগ করবো এবং যে ব্যক্তি এ ধরনের শর্তাবলীর অধিকারী সে আমার পক্ষ থেকে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আমার পক্ষ থেকে মনোনীত; মুসলমানদের অধিকার নেই তার নিকট ব্যতীত অন্য কারো নিকট (বিচার- ফয়সালার জন্য) গমন করার।"

হযরত ইমাম (রহ্ঃ) তার একই গ্রন্থের ১২২ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "ফকীহগণ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর পক্ষ থেকে খেলাফত ও হুকুমাতের জন্য মনোনীত।"

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকীহর শাসনের বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর অভিমত ফকীহর পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর তিনি তার বিভিন্ন লেখা ও ভাষণে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা পুরোপুরিভাবে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ হযরত ইমাম (রহ্ঃ) যে ফকীহর নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তাতে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহর হুকুমাতী এখতিয়ার সমূহকে(শাসন ও কর্তৃত্বের পরিধি) হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) হুকুমাতী এখতিয়ারের সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। আর এ এখতিয়ারের উৎস হচ্ছে অভিন্ন খোদায়ী উৎস। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাসনকার্যের দায়িত্ব একটি খোদায়ী দায়িত্ব, এ কারণে, খোদায়ী শাসকের এখতিয়ার সমূহ নির্ধারণ এবং তার নিয়োগ ও বরখাস্তের বিষয়টিও পরম প্রমুক্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে।[৬]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফকীহ শাসকের নিয়োগ এবং তার শাসনকার্যের বৈধতাদানের ক্ষেত্রে জনগণের কোনোই ভূমিকা নেই[৭] , বরং এ ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা হচ্ছে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত অবস্থায় ফকীহর হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্বের বাস্তব রূপায়ন ও তার প্রতিষ্ঠা। জনগণের তথা মুসলিম জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনের যুগে ফকিহগণের হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্ব বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বস্তুতঃ নবী- রাসূলগণ (আ.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) বেলায় যেমনটি ঘটেছে, ঠিক তদ্রূপই যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফকীহ স্বীয় হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করবেন না (ইমাম খেমেনী(রহঃ) এ বিষয়ে বলেন: স্বীয় জাতির উপর ফকিহদের শাসন চাপিয়ে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ইসলাম আমাদের এ অনুমতি দেয়নি যে, আমরা জনগণের উপর স্বৈরাচারী কায়দায় জেকে বসবো; আল্লাহ ও তার নবী এমন অনুমতি আমাদেরকে দেননি)। জনগণ যদি সমর্থন করে ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে কেবল তখনই দ্বীনের ও ফকীহগণের হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হবে। যদিও জনগণের উচিৎ ফকীহগণের অনুসরণ ও আনুগত্য করা এবং তারা যদি ফকীহগণের হুকুমাতের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে তাহলে তারা গুনাহগার হবে ও এ কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, তথাপি তারা ফকীহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা দেয়া ও না দেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন। তারা যদি সহায়তা প্রদান করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে মনোনীত ফকীহ শাসক হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণকে আল্লাহর ইবাদত ও গোলামী, দ্বীনদারী এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যান।

কতক লোক দু'টি দ্বীনী বিষয়কে পরস্পরের সাথে গুলিয়ে ফেলে লোকদের মনে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে থাকে। তারা প্রশ্ন তোলেঃ বেলায়াতে ফকীহ্ কি নির্বাচনের বিষয়, নাকি মনোনয়নের বিষয়? তাহলে এ ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা কী? নির্বাচন অনুষ্ঠান কেন?

ফকীহ শাসক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত, তবে এ ব্যাপারে জনগণের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ফকীহ শাসককে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনগণের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সহায়তা ও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত হযরত আলী (আ.) রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন এবং তাদের সমর্থনক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেন ও কুফাকে কেন্দ্র করে ন্যায়বিচারের হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন ও যুলুম- অত্যাচারের প্রতিরোধ করেন।

জনগণের এ ক্ষমতা আছে যে, তারা তার প্রতি সমর্থন ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনবে এবং এমন এক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করবে যেখান থেকে তিনি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু জনগণ শাসন ক্ষমতার মূল(অধিকারী) হিসেবে তাকে নিয়োগ ও তার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার শরীয়তসম্মত কর্তৃপক্ষ নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এখতিয়ার। তাই তিনি যাকে এমন এখতিয়ার দিবেন কেবল সেই তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এমন অধিকার প্রদান করতে পারবেন। হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জনগণের ইমাম ও শাসক হিসেবে মনোনীত ছিলেন, সেহেতু তিনিও এ বিশেষ এখতিয়ারের অধিকারী ছিলেন। এ কারণেই তিনি ফকীহকে নিজের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারক নিয়োগ কওে বলেছেন যে, যারা তার মনোনীত শাসক ও বিচারককে প্রত্যাখ্যান করলো তারা আল্লাহর হুকুমকেই প্রত্যাখ্যান করলো।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর প্রথম দিককার একটি ঘটনা। একজন আরব গোত্রপতি তাকে প্রশ্ন করলেনঃ "আপনার নিজের পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের বিষয়টি কি আমাদের ওপর ছেড়ে দেবেন?" তার প্রশ্নের জবাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) বললেনঃ "শাসন- কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ার(ইচ্ছাধীন বিষয়)। তিনি যাকে চাইবেন এ দায়িত্বের জন্য মনোনীত করবেন।"

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে ইসলামী সমাজের সামগ্রিক নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠ ও যুগসচেতন ফকীহ- এর। প্রকৃত পক্ষে তিনি মা'ছূমগণ (আ.) ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে মনোনীত এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যে এখতিয়ার হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর, তা তার ওপর অর্পিত। ইমাম (আ.) স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ এখতিয়ারের অধিকারী এবং ফকীহকে এ দায়িত্বের জন্যে মনোনীত করার বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমেই সম্পাদিত হয়েছে।

মানব সমাজের জন্য ফকিহদের নেতৃত্বের প্রয়োজন কেন?

জবাবঃ রাষ্ট্রদর্শনের মনীষীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানব সমাজের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ তারা মনে করেন যে, সমাজে এমন একটি গোষ্ঠী, দল বা প্রতিষ্ঠান থাকা অপরিহার্য যা আদেশ প্রদান করবে এবং অন্যরা তা মেনে চলবে, অথবা তারা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য আইন- কানুন ও বিধিবিধান সমূহ কার্যকর করবে এবং যারা এ সবের বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করবে তাদেরকে পাকড়াও করবে ও শাস্তি প্রদান করবে।

শুধু নৈরাজ্যবাদীরাই মনে করে যে, মানব সমাজের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। প্রাচীন গ্রীসে এই চৈন্তিক গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলো। নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকগণ মনে করতেন যে, জনগণ যদি আইন-কানুন সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে তারা নৈতিক নিষ্ঠার কারণেই তা মেনে চলবে, অতএব, তখন আর তাদের জন্য রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন হবে না।

এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, নৈরাজ্যবাদীদের এ ধারণা একটি কল্পনা নির্ভর ও ভিত্তিহীন অপরিপক্ব ধারণা। ইসলাম ও মানব সমাজের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনহীনতার ধারণাকে অপরিপক্ব ও অবাস্তব ধারণা বলে গণ্য করেছে। বস্তুতঃ সব সময়ই মানব সমাজে আইন লঙ্ঘনকারী ও অপরাধে লিপ্ত কিছু লোক ছিলো ও আছে এবং নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের লোক থাকবেই।

‘নাহজুল্ বালাগায় হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বাণীতে বলা হয়েছে যে, এমনকি সমাজে যদি ন্যায়বান ও উপযুক্ত লোকদের হুকুমাত না থাকে সে ক্ষেত্রে হুকুমাত বিহীন অবস্থার তুলনায় যালেম ও পাপাচারী লোকদের শাসনও অপেক্ষাকৃত উত্তম। কারণ, মানব সমাজে যদি হুকুমাত বা আইন- কানুন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ না থাকে তাহলে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে সমষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণ বিনষ্ট হবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণের সর্বাধিক অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়বান লোকদের পরিচালিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা সমাজের জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এ রাষ্ট্রের শাসক হবেন হয় স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.), অথবা কোনো মা'ছূম ইমাম (আ.) অথবা পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহ।

বিচারবুদ্ধিজাত প্রথম মূলনীতি অনুযায়ী কোনো মানুষই অন্য কোনো মানুষের ওপর শাসনক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের অধিকার রাখে না, যদি না বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে তার জন্য শাসনক্ষমতার অধিকার প্রমাণিত হয়। আর যেহেতু বিচারবুদ্ধির রায় থেকে সকল সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্ তা'আলার শাসনাধিকার অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সেহেতু নীতিগতভাবে কেবল সেই শাসন কর্তৃত্বই গ্রহণযোগ্য যার যে কোনো হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন- কর্তৃত্ব কার্যতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার শাসন কর্তৃত্বে পর্যবসিত হয়। অন্যথায় পূর্বোক্ত প্রাথমিক মূলনীতির বাইরে যাওয়া যাবে না অর্থাৎ কোনো মানুষই অন্য কোনো মানুষের ওপর শাসন ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের অধিকার রাখে না।

কেবল নবী- রাসূলগণের (আ.) ও তাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের শাসনই কার্যতঃ আল্লাহ্ তা'আলার শাসনে পর্যবসিত হয়। এ ধরনের শাসনের আনুগত্য করা জনগণের অপরিহার্য কর্তব্য। তাহলে একদিকে জনগণের পক্ষে যেমন স্বীয় দায়িত্ব- কর্তব্য পালন করা সম্ভব হবে, তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত শাসকের পক্ষেও সমষ্টির কাজে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করণ ও সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা, সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের বিনাশ প্রতিরোধ এবং সমাজের লোকদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দ্বীন ইসলাম মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে। ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণতম জীবন ব্যবস্থা। ইবাদত- বন্দেগী, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, আইন, শাস্তি, প্রতরক্ষা, শিক্ষা, পরিবার তথা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই ইসলামের আইন- কানুন ও বিধি- বিধান রয়েছে যা প্রগতিশীল ও সার্বিক দিক থেকে উপযোগী। রাষ্ট্র ও শাসক সম্বন্ধেও ইসলামের আইন ও পরিকল্পনা আছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের প্রধানকে অবশ্যই দ্বীনী তথা ইসলামী ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। সেই সাথে তাকে ইসলামের সার্বিক নীতিমালা থেকে বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিধি- বিধান উদঘাটনের যোগ্যতা এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও আমানতদারীর অধিকারী হতে হবে এবং পাপকার্য থেকে দূরে থাকতে হবে।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) যুগের পরে এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে এ দায়িত্ব পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের ওপর অর্পিত। আর জনগণের জন্য ধরণীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্যে তাকে মেনে চলা এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য। মা'ছূম ইমামগণ (আ.) এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফকিহ শাসকগণকে নিয়োগ করেছেন।

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের দশম খণ্ডের ১৭৪ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) তার ইন্তেকালের আগেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপন যুগের সময় পর্যন্ত তার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত ইমামগণই (আ.) তার উম্মতের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত নিষ্পাপ ইমামগণ (আ.) যদ্দিন ছিলেন তদ্দিন তারাই ছিলেন তার স্থলাভিষিক্ত, অতঃপর ফকিহগণ এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।"

ফকিহগণ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হুকুমাতের শীর্ষ ব্যক্তি। আর এ হুকুমাতের প্রধানও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হন এবং মা'ছূমগণ (আ.) তাদেরকে নিয়োগ দেন ও পরিচয় করিয়ে দেন যাতে তারা খোদায়ী হুকুমাতের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

আমরা এ দৃষ্টিকোণের সাথে একমত এবং এতে বিশ্বাসী। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)ও আমাদেরকে এ দৃষ্টিকোণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ২৬ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "মহান আল্লাহ্ তা'আলা কতগুলো আইন- কানুন অর্থাৎ শরয়ী বিধিবিধান

প্রেরণের পাশাপাশি একটি হুকুমাত ও একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

হযরত ইমাম (রহ্ঃ) একই গ্রন্থের ৩১ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "যে কেউ বলে যে, ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, কার্যতঃ সে খোদায়ী বিধি- বিধান বাস্তবায়নের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে এবং সুস্পষ্ট দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন জীবন বিধান হওয়ার সত্যতাকেও অস্বীকার করে।"

ইসলাম মানব সমাজের জন্য রাষ্ট্র এবং আল্লাহর ওলীগণ ও ফকিহগণের শাসন- কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ফকিহগণের শাসন- কর্তৃত্ব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ফকিহ শাসকের শাসন- কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করার মানে হচ্ছে তাগূতকে অভ্যর্থনা জানানো। মানুষের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অতএব, তারা যদি খোদায়ী শাসককে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এর মানে হচ্ছে এই যে, তারা তাগূতের শাসনব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করেছে।

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের ১৭তম খণ্ডের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "একটি হুকুমাত যদি পূর্ব থেকেই পবিত্র শরীয়ত ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বৈধতার অধিকারী না হয়ে থাকে তাহলে তা তার সকল মর্যাদা ও এখতিয়ার এবং তার প্রশাসনযন্ত্র ও সকল শাখা- প্রশাখা সহ তার আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগের অধিকাংশ কাজকর্মই শরয়ী বৈধতা বিহীন হবে। রাষ্ট্রের বিভাগ সমূহের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের শরীয়তের মাধ্যমে বৈধতা লাভ অপরিহার্য; এতদ্ব্যতীত তা অবৈধ হয়ে পড়ে। আর শরয়ী বৈধতা ব্যতিরেকে যদি কাজকর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে রাষ্ট্র ও সরকার তার সকল মর্যাদা ও এখতিয়ার সহ তাগূতী ও অপরাধীতে পরিণত হবে।

অতএব, এটা বলা যেতে পারে না যে, একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকাই যথেষ্ট এবং আমাদের জন্য ফকিহ শাসক ও ফকিহগণের শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

‘ছাহীফায়ে নূর’ গ্রন্থের দশম খণ্ডের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ “প্রজাতন্ত্রের প্রধান বা প্রেসিডেন্টকে ফকিহের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।”

একই গ্রন্থের নবম খণ্ডের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমামের (রহ্ঃ) উক্তি ঃ “প্রজাতন্ত্রের প্রধান বা প্রেসিডেন্টের নিয়োগ যদি ফকিহ শাসকের অনুমোদনক্রমে না হয় তাহলে তা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হলে তা হবে তাগূত এবং তার আনুগত্যও হবে তাগূতের আনুগত্য।”

এর মানে হচ্ছে তার আনুগত্য করা হারাম হবে।

রাষ্ট্রের আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগও কেবল ফকিহ শাসকের মনোনয়ন বা অনুমোদনের মাধ্যমেই শরয়ী বৈধতার অধিকারী হয়। এটাই হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) সহ বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত। হযরত ইমাম (রহ্ঃ)- এর কর্মজীবনও এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তিশীল ছিলো।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) শুরু থেকে মা‘ছূমগণের (আ.) দ্বারা মনোনীত শাসকের তথা পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকিহ শাসকের নিরঙ্কুশ শাসন- কর্র্তৃত্বে এবং দ্বীনী হুকুমাতের শরয়ী বৈধতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ বিশ্বাসের ওপর অটল ছিলেন এবং তদনুযায়ী আমল করেছেন। এ অভিমত ব্যক্তকরণ ও তদনুযায়ী আমল করণ ছিলো তার দ্বীনী দায়িত্ব। আমরাও এর ভিত্তিতে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী এবং এর অনুসারী।

বেলায়াতে ফকীহ্ কি ঐশী পদ, নাকি পার্থিব ও জনগণের দ্বারা নির্বাচনীয় পদ?

জবাবঃ যেহেতু জনগণ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তারা ফকিহ্ শাসককে নির্বাচিত করেন, অতএব, এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নেতা পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং এ হিসেবে এটি একটি পার্থিব পদ ও তার পদাভিষেক কার্যতঃ জনগণ কর্তৃক আইনগত বৈধতা লাভ করে, সেহেতু উপরোক্ত প্রশ্নের ও সংশয়ের উদয় হয়েছে।

এ প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাবে বলতে হয় ঃ এভাবে জনগণ কর্তৃক বৈধতা প্রদান মানে প্রকৃত পক্ষে ফকিহ্ শাসককে গ্রহণ করে নেয়া। ফকিহ্ শাসকের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে এমন একটি পথ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যাতে আইনানুগ ফকিহ্ শাসক জনগণের সমর্থনের ফলে ইসলামী সমাজে খোদায়ী আইন- কানুন ও বিধি- বিধান বাস্তবায়ন ও কার্যকর করণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হন।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণায় বলেনঃ "শরয়ী অধিকার এবং ইরানী জনগণ আন্দোলনে শরীক হয়ে সারা ইরানে বহু সংখ্যক বিশাল বিশাল জনসভা ও বিরাট বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রায় সর্বসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহকারে যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা থেকে উৎসারিত আইনগত অধিকারের ভিত্তিতে ... আমি আপনাকে ৮ অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করলাম।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর দৃষ্টিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচন - তা বিশাল বিশাল জনসভা ও বিরাট বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমেই হোক বা সর্বোচ্চ নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের মাধ্যমেই হোক - মুজতাহিদ শাসকের হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্বের বৈধতার উৎস

নয়। কারণ, হুকুমাতের বৈধতার মূল উৎস হচ্ছে দ্বীন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়াত বা আইন-বিধান প্রণয়ন বিষয়ক শাসন- কর্তৃত্ব। আর জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণ করার ফলে প্রকৃত পক্ষে ফকিহের ঐশী হুকুমাত বাস্তবে কার্যোপযোগিতা লাভ করে এবং এর ফলে সে হুকুমাত সুদৃঢ় ও টেকসই হয়।

জনগণ যখন এ ধরনের হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্বকে গ্রহণ করে নেয় তখন দ্বীনের ওপর আস্থার ও খোদা- কেন্দ্রিকতার পতাকা উড্ডীন হয় এবং বেলায়াতে ফকীহর ছায়াতলে জনগণের অন্তঃকরণে ও দৃষ্টিতে তাওহীদ, নবুওয়াত ও ইমামতের সীমাহীন বরকত বর্ষিত হতে থাকে এবং পূর্ণতার পথ সমুজ্জল হয়ে ওঠে।

জনগণের এ ভূমিকাকেই গ্রহণযোগ্যতা (مقبوليت) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ গ্রহণযোগ্যতা সকল যুগেই বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিলো এবং সব সময়ই আদর্শ ও নেতৃত্বের পাশে স্থান লাভ করেছে। আর এ হচ্ছে এমন এক বাস্তবতা যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এর অধিকারী ছিলেন। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

(هو الذى ايدک بنصره و بالمؤمنين)

"তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা আপনাকে শক্তিশালী করেছেন।"

এর কারণেই, আমরা দেখতে পাই, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) বলেনঃ "জনগণ যদি তাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় একজন ন্যায়বান ফকিহকে অধিষ্ঠিত করার জন্য নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করে এবং তারা এক ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করেন, অতঃপর তিনি নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। ফলে তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত শাসক এবং তার আদেশ- নিষেধ অবশ্য কার্যকরযোগ্য।" (ছাহীফায়ে নূর, ২১তম খণ্ড, পৃঃ ১২৯)

জনগণ যদি নেতাকে সমর্থন না করে এবং নেতার পিছনে না থাকে তাহলে সুস্পষ্ট যে, জনগণের নিকট তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং এ কারণে তার আদেশ- নিষেধ কার্যকর হয় না। কিন্তু

এর মানে ফকিহ্ শাসককে জনগণ কর্তৃক বৈধতা প্রদান নয়। কারণ, গ্রহণ করা- না করা ও বৈধতা প্রদান এক কথা নয়। জনগণ গ্রহণ না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত শাসক শাসনক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ না পেতে পারেন, কিন্তু সে কারণে দ্বীন ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার মনোনয়ন বৈধতা হারায় না।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) অন্যত্র এ বিষয়টির ওপর সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন। 'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমামের (রহ্ঃ) যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকিহের শাসন- কর্তৃত্ব এমন কোনো বিষয় নয় যা নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদ কর্তৃক তৈরী হয়েছে। বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মহান আল্লাহ্ তা'আলা তৈরী করেছেন। আর এ হচ্ছে সেই শাসন- কর্তৃত্ব স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) যার অধিকারী ছিলেন।"

একই গ্রন্থের ১৯তম খণ্ডের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত উক্তিতে হযরত ইমাম (রহ্ঃ) বলেনঃ "পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকিহগণ মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে সকল শরয়ী, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের অধিকারী, আর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে সকল বিষয়ের দায়িত্বই তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে।"

এ ধরনের ফকিহ্ শাসককে সমর্থন, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আর ফকিহ্ শাসক যখন জনগণের সমর্থনপুষ্ট হন তখন তার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেনঃ

لو لاحضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر.

"যদি এ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত না হতেন এবং এই সাহায্যকারীগণ থাকার কারণে আমার জন্য হুজ্জাত (চূড়ান্ত প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত না হতো (তাহলে আমি খেলাফতের এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না)।"

নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব হচ্ছে মা'ছূম ইমামগণের (আ.) ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ফকিহ্ শাসককে চিহ্নিত করা ও জনগণের নিকট পরিচয় করিয়ে

দেয়া। তারা হচ্ছেন মুজতাহিদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং এরূপ শাসককে চিহ্নিতকরণের যোগ্যতার অধিকারী। তাই তারা সাক্ষ্য দেন যে, এই ব্যক্তি নেতা হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। বিষয়টি এমন নয় যে, নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যগণ - যারা সমাজের সদস্যগণ তথা জনগণের অন্যতম, তারা এক ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে বৈধতা প্রদান করেন এবং তাকে এ পদের জন্য নির্বাচিত করেন। বরং নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যগণের কাজ হচ্ছে তারা নেতৃত্বের মানদণ্ড সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখেন তার ভিত্তিতে সমকালে এ মানদণ্ড যার ব্যাপারে প্রযোজ্য এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা। আর তাদের এভাবে সাক্ষ্যদানের ফলে যে সাধারণ জনগণ ফকিহ শাসককে চিহ্নিত করতে সক্ষম নয় তাদের করণীয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

অতীতেও সাধারণ লোকেরা মুজতাহিদদেরকে চেনার জন্য তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন এমন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতো। তারা তখন নিজ নিজ শহরের শীর্ষস্থানীয় ও মোত্তাকী-পরহেযগার খ্যাতনামা আলেমদের নিকট যেতো এবং জিজ্ঞেস করতো ঃ "সবচেয়ে বড় অলেম কে? বেশী জ্ঞানী কে?" আজকের দিনেও সাধারণ জনগণ পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে। আর নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে এ ধরনের ফকিহ নেতাকে চিহ্নিত করেন এবং তাকে জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দেন, যাতে জনগণ মা'ছূম ইমামের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকিহ শাসকের প্রতি সমর্থন ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধি- বিধান বাস্তবায়নের পথকে মসৃণ করে দিতে পারে।

একজন লোকের মধ্যে ফিক্বহী বিষয়ে বিশেষজ্ঞত্ব, দ্বীনী আইন- কানুন ও বিধি- বিধান চিহ্নিত ও প্রমাণিত করণের যোগ্যতা এবং দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি সমূহের সাথে পরিচিতির মাত্রা কতখানি তা যথাযথভাবে বুঝতে পারা কোনো সহজ কাজ নয়। এ কারণেই এ বিষয়ে সচেতন ও বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তির শরণাপন্ন না হয়ে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসককে চিনতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা যদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিষয়টির প্রতি

দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত ফকিহ্ শাসককে চেনার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এমন বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া যারা জনগণের হাতকে একজন ন্যায়বান, মোত্তাকী ও সুপরিচালক ফকিহের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন এবং যাদের ব্যাপারে জনগণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হবে।

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ফকিহ্ শাসক মাত্র একজন হওয়া জরুরী ?

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ফকিহ্ শাসক মাত্র একজন হওয়া জরুরী, নাকি প্রত্যেক জাতির শাসক স্বতন্ত্র হতে পারেন?

জবাবঃ হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ), মরহূম নারাক্বী[৯] , মরহূম মারাগ্বেয়ী[১০] ও 'জাওয়াহের' গ্রন্থের প্রণেতা প্রমুখ বহু মনীষী এবং এমনকি মরহূম নায়ীনী[১১] বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব দলীল উল্লেখ করেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য একজন ফকিহ্ শাসক থাকা প্রয়োজন।

এ অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে এ দৃষ্টিকোণ যে, ফকিহ্ শাসক আল্লাহ্ তা'আলা ও তার খাছ বান্দাহেদর পক্ষ থেকে মনোনীত হন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফকিহ্ শাসক মনোনীত করেন এবং সকলের জন্যই তার আনুগত্য করা অপরিহার্য।

তাত্ত্বিক দিক থেকে ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই বাঞ্ছিত যে, সমগ্র ইসলামী জাহানের জন্য একজন মাত্র ফকিহ্ শাসক থাকবেন। নেতৃত্বের এ ঐক্য ইসলামী ঐক্যকে এবং মুসলমানদের সামাজিক শক্তি ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় ফিক্বহী বিষয়ের মতো নয় যে, জনগণ এ ব্যাপারে তাদের পছন্দ মোতাবেক বিভিন্ন মারজা- এ তাক্বলীদের [১২] কাছে যাবে অথবা সতর্কতার মূলনীতির ভিত্তিতে আমল করবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সামষ্টিক বিষয়াদি এমন যে, শেষ পর্যন্ত জনগণকে একটি রায়ের ভিত্তিতে আমল করতে হবে। আর এ ব্যাপারে আইনগত ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ফকিহ্ শাসকের রায়েরই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি রয়েছে। কারণ, মুজতাহিদ ফকীহ্ পরম দয়াবান আল্লাহ্ তা'আলা ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত। সুতরাং সকলের জন্যই তার রায় মেনে চলা অপরিহার্য।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন এলে এক ব্যক্তিকে আদেশ দিতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ করবো, নাকি সন্ধি করবো। এ ব্যাপারে একজন ফকিহ্ শাসকের পক্ষ থেকে আদেশ আসতে হবে এবং সকলকে তার আদেশ মেনে নিতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। নচেৎ সমস্যার সৃষ্টি হবে; বিভিন্ন মতের উদ্ভব ঘটবে; কতক ব্যক্তি শান্তির সমর্থন করবেন এবং অপর কতক ব্যক্তি যুদ্ধের সমর্থন করবেন। এভাবে বিভিন্ন মতের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং করণীয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে, আর এর পরিণতি হচ্ছে পরাজয়।

এমনকি ঈদুল ফিতর উদযাপনের মতো বিষয়েও প্রায় সর্বসম্মত সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ ও মারজা- এ তাক্বলীদ্ অভিমত পোষণ করেন যে, এ ব্যাপারে ফকিহ্ শাসকের রায়ই অনুসৃত হতে হবে। কারণ, এটি একটি সামষ্টিক বিষয় এবং মতামতের বিভিন্নতা জনিত বিশৃঙ্খলা এড়ানো, জনগণকে ঈদের দিনে হারাম রোযা রাখার আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখা ও মাহে রামাযানের শেষ দিবসে রোযা রাখতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইসলাম এ ব্যাপারে ফকিহের রায়কে কার্যকর গণ্য করেছে। এমতাবস্থায় ফকিহ্ শাসক যদি একজন না হন তাহলে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং, খোদা না করুন, মুসলিম জনগণের একাংশের দ্বারা গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে পড়া অসম্ভব কিছু নয়।

সমকালীন বিশ্বে যখন সর্ব প্রথম ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেলায়াতে ফকীহ্ বা ফকিহের শাসন বাস্তবে কার্যকর হয় তখন প্রায় সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- কে ইসলামী জাহানের ফকিহ শাসক রূপে গ্রহণ করা হয়। সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানই তার বেলায়াত বা দ্বীনী শাসন- কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। ঐ সময় কেউই বলে নি যে, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ইসলামী নেতৃত্বের জন্য হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর চেয়ে যোগ্যতর কেউ আছেন। শাসক হিসেবে একমাত্র হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর পক্ষেই সমগ্র ইসলামী জাহানের কল্যাণ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিলো এবং এবং একমাত্র তিনিই সমাজকে ইসলামী আইন- কানুন ও বিধি- বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে সক্ষম ছিলেন। সমগ্র ইসলামী জাহানই এ বিষয়টি এবং এ তত্ত্ব ও আদর্শিক অভিমতকে মেনে নেয়।

ইসলামী বিপ্লবের পথিকৃৎ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর পরেও এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যিনি হযরত ইমামের অনুরূপ, যার মধ্যে ইমামের অভিন্ন চিন্তা- চেতনা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি হলেন হযরত আয়াতুল্লাহ্ ওযমা সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী। হযরত ইমামের পরে তিনি ফকিহ শাসকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং সমগ্র ইসলামী জাহান তার একক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানায়। ইসলামী জাহানে তার এ গ্রহণযোগ্যতায় এখনো কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, বরং ইসলামী দুনিয়া তাকে নিরঙ্কুশ শাসন-কর্তৃত্বের এখতিয়ারের অধিকারী ফকিহ শাসক হিসেবে গণ্য করে।

বস্তুতঃ ইসলামী জাহানের ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, শৌর্যবীর্য ও সম্মান এই নেতৃত্বের একত্বের ছায়াতলেই নিহিত। আজকের দুনিয়ায় ইরাকী জনগণ নিজেদেরকে ইসলামী বিপ্লবের রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর অনুসারী রূপে গণ্য করে। লেবাননের বিপ্লবী মুসলিম জনগণের সংগঠন হিযবুল্লাহর নেতা সাইয়েদ হাসান নাছরুল্লাহ্ নিজেকে মুজতাহিদ শাসকের সৈনিক বলে মনে করেন। মুসলিম দেশসমূহ ও ইউরোপ- আমেরিকা সহ বিশ্বের যে কোনো স্থানের মুসলিম জনগণের অধিকাংশই নিজেদেরকে ফকিহ শাসকের অনুগত ও অনুসারী বলে মনে করে।

ফকিহের নেতৃত্বকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে এ সমঝোতা ও মতৈক্য ইসলামী সমাজের ঐক্যের ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের এবং ইসলামের বিরাট শক্তির সামনে ইসলামের দুশমনদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

এটা নিঃসন্দেহ যে, ইসলাম এটাই চায় এবং এটাকেই সমর্থন করে ও স্বীকৃতি দেয়। ইসলামে নেতৃত্বের ঐক্য হচ্ছে একটি অনুসরণীয় আদর্শ তত্ত্ব এবং এটা সকলের দ্বারাই স্বীকৃত হয়েছে যে, নেতৃত্বের ঐক্য ইসলামী জাহানের অগ্রগতির এবং বিশ্বের কুফরী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইসলামী জাতিসমূহের বিজয়ের কারণ।

আমরাও হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ), মরহূম নারাক্বী, মরহূম মারাগেয়ী, ‘জাওয়াহের’ গ্রন্থের প্রণেতা ও মরহূম নায়ীনীর অনুসরণে এ মতকেই সমর্থন করি। আর যেহেতু আমাদের ‘আক্বিদাহ্ হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদ শাসক স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা ও মা‘ছূমগণের (আ.) পক্ষ থেকে

মনোনীত, সেহেতু আমাদের এ- ও 'আক্বিদাহ্ যে, সারা বিশ্বের জনগণের, বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য একজন একক মুজতাহিদ শাসকের আনুগত্য ও অনুসরণ করা অপরিহার্য।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার লেখা 'হুকুমাতে ইসলামী' গ্রন্থে বলেনঃ "রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তার দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার সকল সামষ্টিক কাজকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) যে শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার ছিলো ফকিহ শাসক সেই একই শাসন- কর্তৃত্বের অধিকারী।"

হযরত ইমাম ফকিহ শাসকের জন্য রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) ন্যায় অভিন্ন ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রবক্তা ছিলেন, বরং একে অপরিহার্য গণ্য করতেন। তিনি মনে করতেন, ফকিহ শাসক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হুবহু হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের অধিকারী।

এমন কথা কেউ বলে না যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) হুকুমাত একটি বা কয়েকটি দেশে বা ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তাই মুজতাহিদ ফকীহ্ হুকুমাতের জন্যও কোনো সীমারেখা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, ফকিহ শাসক বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য শাসক। সুতরাং সকল মুসলমানেরই উচিৎ তার রায় ও ফতোয়া অনুসরণ করা।

ফকিহ্ শাসক কি বিশ্বের সকল দেশের সার্বিক পরিচালনায় সক্ষম?

জবাবঃ মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের লক্ষ্য কেবল তাদের বস্তুগত ও পার্থিব কল্যাণ নিশ্চিত করা নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, মানুষের জন্য নিরাপত্তা ও আরাম- আয়েশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ এবং তার কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ভূমিকা মাত্র। আর এ চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক পূর্ণতা ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন।

মানুষ যাতে তার এ চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এমন আইন- কানুন বাস্তবায়ন করা মানুষের সত্তার সকল দিক ও তার জীবনের সকল বিভাগ যার আওতাভুক্ত থাকবে - যাতে সে আইন মানুষের সকল দিকের কল্যাণই নিশ্চিত করতে পারে। আর ইসলামের ছায়াতলে ও এর সমুন্নত আইন- কানুন সমূহ বাস্তবায়ন ছাড়া এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

ইসলামী হুকুমাত যাতে মানুষের জন্যে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে এ হুকুমাতের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই এমন লোকদের হাতে থাকা দরকার যারা দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবেন ও দ্বীন কেন্দ্রিক যিন্দেগী যাপন করবেন, আর তাদের শীর্ষে অবস্থান করবেন পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসক।

এ যুগে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান হচ্ছে এ দৃষ্টিকোণের বাস্তব আদর্শ। এ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচরণ এবং হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) ও হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর অনুসরণই ছিলো ইসলামী হুকুমাতের প্রতি ইরানী জনগণের সমর্থন এবং তাদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ পথে বিপদাপদ, দুঃখকষ্ট, মূল্যস্ফীতি, ঘাটতি, বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাত্মক আঘাত এবং অন্য বহু ধরনের কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করে নেয়ার পিছনে নিহিত চালিকা শক্তি।

আমরা যে বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম জনগণের মাঝে যালেম- অত্যাচারী ও বলদর্পীদের বিরুদ্ধে এবং দাম্ভিক বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরাট ও ব্যাপক বিজয়ের আশা লক্ষ্য করছি - এর সবই হচ্ছে উপরোক্ত দৃষ্টিকোণের সাথে সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদ শাসক ও দ্বীনী হুকুমাতের আশা- আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন দিকের বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমান যুগে যখন দুনিয়া কেন্দ্রিক জীবনদর্শনে বিশ্বাসী গোষ্ঠী তাদের নিজেদের একটি বা কয়েকটি ভুলের কারণে অনেক সময় তাদের বিশাল আধিপত্যের ভিত্তিসমূহকে ধ্বসে পড়ার মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে, ঠিক এমনই এক যুগে মুজতাহিদ শাসকের শাসন ও কর্তৃত্ব সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় তার শাসন- কর্তৃত্বের শক্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে যা তার শক্তি ও মর্যাদার সামনে যালেম শাসকবর্গকে নতজানু হতে বাধ্য করছে।

যেহেতু এ দৃষ্টিকোণ খোদায়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভরতা থেকে গড়ে উঠেছে সেহেতু নিঃসন্দেহে এ দৃষ্টিকোণের প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যে সব কাজ সম্পাদিত হয়েছে তা এ বাস্তবতারই সাক্ষ্য বহন করছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদ শাসকের শাসনাধীন ইরানের ওপর যে দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় সে যুদ্ধে ইরানের এমনকি এক বর্গ সেন্টিমিটার জায়গাও হাতছাড়া করতে হয় নি। ইতিপূর্বে দীর্ঘ রাজতান্ত্রিক যুগে যখনই ইরানের যে কোনো অংশেই যুদ্ধ হয়েছে তখনই ইরানী ভূখণ্ডের কোনো না কোনো অংশ শত্রুকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর শাসনামলে এ ধরনের কোনো কিছু ঘটে নি।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের স্থাপত্য পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, ইসলাম ও ইরানী জনগণের দুশমনরা আজ পর্যন্তও ফকিহ শাসক কেন্দ্রিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কোনোরূপ ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় নি। বরং জ্ঞান- বিজ্ঞান, রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও বৈশ্বিক মর্যাদার বিচারে মুজতাহিদ শাসকের মর্যাদা, শৌর্যবীর্য ও কর্তৃত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে

চলেছে। বস্তুতঃ মুজতাহিদ শাসকের শাসন ও নেতৃত্ব- কর্তৃত্বের ছায়াতলে বর্তমানে ইসলামী জাহান অসাধারণ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের দাম্ভিক বৃহৎ শক্তিবর্গ ও ইসলামী হুকুমাতের অকল্যাণকামীরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার মুখোমুখি হয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে শত শত শয়তানী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়া হয় এবং যে সব ভয়ঙ্কর তত্ত্ব ছড়িয়ে দেয়া হয় তার মুখোমুখি হলে অন্য যে কোনো সরকারই ধরাশায়ী হয়ে যেতো। কিন্তু ফকিহ শাসকের নেতৃত্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার সমস্ত রকমের সমস্যা সত্ত্বেও আগের মতোই জনগণের সমর্থনের অধিকারী রয়েছে। ইরানী জনগণ তাদের জীবনের সকল কঠিন অবস্থা সহ্য করে এবং মূল্যস্ফীতি ও ঘাটতির শিকার হয়েও ইসলামী হুকুমাতের মূল ধারণা ও রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর প্রতি তাদের সমর্থন একইভাবে অব্যাহত রেখেছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করা হয় তার মধ্যকার যে কোনো একটি ষড়যন্ত্রই অন্য যে কোনো সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট হতো। এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের টিকে থাকা এবং বিশ্বে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, ফকিহ শাসক বিশ্বের দেশ সমূহের পরিচালনা ও পথনির্দেশনায় পুরোপুরি সক্ষম। ইসলামের দুশমনরাও ফকিহ শাসকের এ শক্তি ও সক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তারা সব সময়ই বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে ফকিহ শাসক ও ফকিহের শাসনকে দুর্বল করার এবং তার শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব কি ইমাম খোমেইনীর (রহ্ঃ) উদ্ভাবন

বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব কি ইমাম খোমেইনীর (রহ্ঃ) উদ্ভাবন, নাকি অন্য মুজতাহিদগণেরও একই মত?

জবাবঃ শিয়া মাযহাবের রাজনৈতিক আদর্শে বেলায়াতে ফকীহ্ তথা পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ফকিহ শাসকের শাসনের তত্ত্ব অত্যন্ত সুপ্রাচীন। আয়াতুল্লাহ্ মোল্লা আহমাদ নারাক্বী বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ প্রশ্নে শিয়া মাযহাবে মোটামুটিভাবে মতৈক্য (ইজমা) রয়েছে এবং মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ফকিহগণের মধ্যে কেউই বেলায়াতে ফকীহ্ প্রশ্নে আপত্তি তোলেন নি।"

ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি শিয়া মাযহাবের অকাট্য ও বিতর্কাতীত বিষয় সমূহের অন্যতম। যারা বলে যে, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এটা মানতেন না তাদের এ ধারণা এ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।"

বস্তুতঃ ইসলামী বিপ্লবের পথিকৃৎ হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) যে কাজটি আঞ্জাম দেন তা হচ্ছে, তিনি বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বকে ফিক্বহী আলোচ্য বিষয়ের বাইরে নিয়ে আসেন এবং 'ইলমে কালামের দৃষ্টিতে এর যথার্থ স্থানে একে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি বিচারবুদ্ধিজাত ও কালাম শাস্ত্রীয় অকাট্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা এ তত্ত্বকে বিকশিত করেন এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের সকল বিভাগে এর ছায়া বিস্তার করে দেন। এরপর তিনি এ আলোচ্য বিষয়টিকে বাস্তবে রূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সমাজের বুকে মুজতাহিদ শাসকের নেতৃত্বাধীন দ্বীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি আমাদের উদ্ভাবিত কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং এ বিষয়টি শুরু থেকেই একটি আলোচ্য বিষয় ছিলো।"

হযরত ইমাম তার ‘কাশফুল আসরার’ গ্রন্থের ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ ফকিহের শাসন- কর্তৃত্বের যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা সেই প্রথম দিন থেকেই স্বয়ং ফকিহগণের মধ্যে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিলো। বেলায়াতের বিষয়টি কি কোনো মৌলিক বিষয় অথবা নয় তথা এটির কি কোনো ভিত্তি আছে নাকি নেই এবং সেই সাথে ফকিহের শাসন- কর্তৃত্বের সীমারেখা এবং তার হুকুমাতের আওতা কতখানি - এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা হচ্ছে ফিক্বাহর একটি বিস্তারিত আলোচনার শাখা যে সম্পর্কে দুই পক্ষই দলীল উপস্থাপন করেছেন, আর এসব দলীলের বেশীর ভাগই হচ্ছে এমন সব হাদীছ যা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে।”

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা‘ছূম ইমামগণের (আ.) যুগেও বেলায়াতে ফকীহ্ অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিলো। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেনঃ جعلته عليكم حاكماً - “আমি তাকে (ফকীহকে) তোমাদের ওপর শাসক ও বিচারক নিয়োগ করলাম।” এখানে ইমাম (আ.) ‘হাকেম্’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, ‘হাকেম’ শব্দ দ্বারা বিচারকার্য সহ সামগ্রিকভাবে একজন শাসকের সকল ধরনের দায়িত্ব বুঝানো হয় তথা হুকুমাত ও শাসন- কর্তৃত্বের সকল দিকই ‘হাকেম’- এর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত।

আর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর দীর্ঘ আত্মগোপনরত থাকার যুগে বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়। ইমাম মাহদী (আ.) তার সংক্ষিপ্ত ও সীমিত আত্মগোপনের যুগে [১৩] ইসহাক বিন ইয়াকুবের প্রশ্নের যে লিখিত জবাব দেন তা বেলায়াতে ফকীহ্ একটি সুপ্রাচীন আলোচ্য বিষয় হওয়ার সপক্ষে সর্বোত্তম দলীল। এতদসংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি সনদ হিসেবে ও ফতোয়া হিসেবে খুবই বিখ্যাত। শিয়া মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন আলেম শেখ ছাদূক্ব (রহঃ)[১৪] তার লেখা ‘কামালুদ্দীন’ (দ্বীনের পূর্ণত্ব) গ্রন্থের ৪৮৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর এ লিপিটি উদ্ধৃত করেছেন।

ইসহাক বিন ইয়াকুব্ কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়ে ইমাম (আ.)- এর বরাবরে লিখিত প্রশ্ন পাঠালে ইমাম (আ.) উক্ত লিখিত জবাব প্রেরণ করেন। ইসহাক বিন ইয়াকুব্ তার পত্রে যে সব বিষয়

জানতে চান তার মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন ছিলো এই যে, আপনার (দীর্ঘ) আত্মগোপন যুগে আমাদের সামনে যে সব নতুন ঘটনা সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেনঃ "আর যে সব ঘটনা সংঘটিত হবে সে সব ব্যাপারে তোমরা আমাদের হাদীছ বর্ণনাকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করবে। কারণ, তারা হচ্ছেন তোমাদের জন্য আমার হুজ্জাত, আর আমি তাদের জন্য আল্লাহর হুজ্জাত।"

ইসহাক বিন ইয়াকুব্ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর বরাবরে যে প্রশ্ন করেন তার উদ্দেশ্য ছিলো তার দীর্ঘ আত্মগোপনের যুগে ইসলামী সমাজের সামষ্টিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ। সাধারণভাবে শিয়া মাযহাবের অনুসারীগণ ও বিশেষভাবে শিয়া ওলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে উক্ত লিখিত লিপিটি প্রেরণের ঘটনা ও তার প্রাচীনত্বের বিষয়টি বিশ্বাস করে থাকেন।

মরহূম আল্লামা কাশেফুল্ গ্বেত্বা'[১৫] তার কাশ্ফুল্ গ্বেত্বা' গ্রন্থে, মরহূম মোল্লা আহমদ নারাক্বী তার 'আওয়ায়েদুল আইয়াম্ গ্রন্থে, মরহূম মীর ফাত্তাহ্ হোসেনী মুরাগ্বী তার "আল- 'আনাভীন্" গ্রন্থে, মরহূম ইমামুল মোহাক্কেক্বীন তার "জাওয়াহেরুল কালাম" গ্রন্থে, মরহূম শেখ আ'যাম্ আনছারী তার "মাকাসেবে মোহাররামাহ্" গ্রন্থে, মরহূম বাহরুল 'উলূম্[১৬] তার "বালাগ্বাতুল্ ফাক্বীয়্যাহ্" গ্রন্থে, মরহূম মোদাররেস[১৭] তার "উছূলে তাশকীলাতে 'আদলীয়্যাহ্" গ্রন্থে, তেমনি আয়াতুল্লাহ্ আল- 'উযমা বোরূজার্দী[১৮] তার "আল- হেদায়াতু ইলা মান্ লাহুল্ ভিলাইয়্যাহ্" গ্রন্থে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মরহূম আল্লামা নায়ীনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তাম্বিহুল্ উম্মাহ্ ওয়া তান্যীহুল্ মিল্লাহ্"য় এ বিষয়ে অত্যন্ত গভীর ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১৫০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "ইতিপূর্বে যেমন উদ্ধৃত করেছি, মরহূম কাশেফুল গ্বেত্বা'ও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ... ওলামায়ে মোতাআখখেরীনের[১৯] মধ্য থেকে মরহূম নারাক্বী মনে করেন যে, মুজতাহিদগণ

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সকল মর্যাদার অধিকারী। আর মরহূম নায়ীনীও বলেন যে, ওমর বিন হানযালাহ্ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত থেকে এ বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়।"

ওমর বিন হানযালাহ্ যে রেওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন তা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) থেকে বর্ণিত এবং তা হযরত ইমাম (আ.)- এর যুগেই বর্ণিত হয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর পরবর্তী কালের প্রায় সর্বসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম এ রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন। উক্ত রেওয়ায়েতে হযরত ইমাম (আ.) ফকীহকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তার শাসন- কর্তৃত্ব ও বিচারের অধিকারকে গ্রহণ না করার বিষয়টিকে মা'ছূম ইমামগণের (আ.) শাসন- কর্তৃত্ব ও বিচারের অধিকারকে গ্রহণ না করার ও তাদের হুকুম প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য বলে গণ্য করেছেন এবং এ কাজকে তিনি গুনাহে কবিরাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, মা'ছূম ইমামগণের (আ.) হুকুম কবুল না করা হুবহু আল্লাহ্ তা'আলার শরয়ী ও আইনগত কর্তৃত্ব গ্রহণ না করার, বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য। আর ইমাম (আ.) এর গুনাহকে শিরকের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেন।

গোটা ইসলামের ইতিহাসে মুজতাহিদগণ এ সত্যটিকে স্বীকার করেছেন। অনেকে এ বিষয়টি ফিকাহ্ শাস্ত্রে এবং অনেকে এটিকে কালাম শাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালেও, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অনেকে এ বিষয়টি নিয়ে কালাম শাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। অন্য অনেকে বিষয়টি আমল সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় বিধি- বিধান জারীর মাধ্যমে বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বে তাদের 'আক্বিদাহকে বাস্তবে প্রমাণ করেছেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদের পক্ষ থেকে জারীকৃত রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আদেশকে ফকীহর এখতিয়ারের কার্যকরিতার বিশাল ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মরহূম মীর্যায়ে শীরাযী[২০] ও মরহূম মীর্যা মোহাম্মাদ তাক্বী শীরাযীর বাস্তব কর্মনীতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেনঃ "তামাক বর্জনের জন্যে মীর্যায়ে শীরাযী যে আদেশ জারী করেছিলেন প্রকৃত পক্ষে তা ছিলো একটি রাষ্ট্রীয় আদেশেরই

অনুরূপ এবং তার অনুসরণ অন্যান্য ফকীহগণের জন্যও ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য ছিলো। তৎকালে অল্প কয়েক জন বাদে ইরানের ওলামায়ে কেরামের সকলেই এ আদেশের অনুসরণ করেন।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) আরো বলেনঃ "মরহূম মীর্যা মোহাম্মাদ তাকী শীরাযী যখন জিহাদের আদেশ দেন - যদিও তার নাম দেয়া হয় প্রতিরক্ষা, তখন ওলামায়ে কেরামের সকলেই তার অনুসরণ করেন। কারণ, এটি ছিলো একটি হুকুমাত সংশ্লিষ্ট আদেশ।"

বস্তুতঃ হুকুমাত সংশ্লিষ্ট বা রাষ্ট্রীয় আদেশ মুজতাহিদ শাসকের পক্ষ থেকে জারী করা হয়। যিনি এ ধরনের আদেশ জারী করেন নিঃসন্দেহে তিনি মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্বের ধারণায় বিশ্বাস পোষণ করেন। আর যিনি পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদের আদেশ পালন করেন কার্যতঃ তিনিও বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বকে স্বীকার করেন। এভাবে মুজতাহিদ কর্তৃক হুকুম জারী এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক তা মেনে নেয়া ও তদনুযায়ী আচরণ করা থেকে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ একটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন তত্ত্ব। এ বিষয়টির সপক্ষে আরো প্রমাণ এই যে, অন্যান্য ফকীহগণও বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অতীতের ফকীহগণের কেউ কেউ কার্যতঃও বেলায়াতে ফকীহর এখতিয়ার সমূহকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর ভূমিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি বেলায়াতে ফকীহকে ইমামতের পিছনে জুড়ে দিয়েছেন এবং এভাবে বেলায়াতের বৃক্ষকে পত্রপল্লব ও ফুলেফলে সুশোভিত করেছেন। বর্তমানেও ইসলামী বিপ্লবের রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর পথনির্দেশনায় এ বৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করা হচ্ছে এবং দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে তা অধিকতর মনোরম ও অধিকতর সুস্বাদু ফল প্রদান করে চলেছে। বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরামও বেলায়াতে ফকীহর মহান মর্যাদাকে বাস্তবতার ময়দানে দেখতে পেয়ে এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখছেন এবং প্রায় সকলেই অপরিহার্য গণ্য করে কার্যতঃ এর অনুসরণ করছেন।

বেলায়াতে ফকীহ্ কি অনুসন্ধানীয়, নাকি অন্ধভাবে অনুসরণীয়?

জবাবঃ বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টি ইমামতের ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হয়। আর ইমামত হচ্ছে ‘ইলমে কালামের একটি আলোচ্য বিষয়। ‘ইলমে কালামে দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা তথা আল্লাহ্ তা‘আলার পরিচয়, নবুওয়াত, ইমামত ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মা‘ছূম ইমামগণের (আ.) ইমামত প্রমাণিত হওয়ার পর পরই জনগণের করণীয় এবং পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী দ্বীনী নেতৃত্বের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। আর এর ফলেই বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি আলোচনায় আসে।

অতীতের ওলামায়ে কেরাম ফিকাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাতে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) এ বিষয়টিকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং একে এর স্বকীয় স্থানে অর্থাৎ কালাম শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর তিনি বিচারবুদ্ধির অকাট্য দলীল ও উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল সমূহ দ্বারা এ বিষয়টিকে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচ্য বিষয়রূপে বিকশিত করেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং যেভাবে এ বিষয়টিকে ইমামতের পর পরই ও এর ধারাবাহিকতা হিসেবে আলোচনা করেছেন তার মাধ্যমে তিনি এমন এক দৃষ্টিকোণ তৈরী করেছেন যা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে দ্বীনের মৌল নীতিমালা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাস পোষণ বৈধ নয়, সেহেতু এ বিষয়টি প্রমাণের জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিচার- বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস পোষণ বৈধ হবে না।

এ সংশয়ের জবাবে বলতে হয়ঃ

১) এমন নয় যে, 'ইলমে কালামের আওতাভুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে কোনো বিষয়েই অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা বৈধ হবে না। 'ইলমে কালামের এমন অনেক বিষয়ই রয়েছে যে বিষয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করা জরুরী।

২) যেহেতু বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টি ইমামত সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হয়, সেহেতু এটি একটি কালাম শাস্ত্রীয় বিষয়। কিন্তু মুজতাহিদ শাসকের হুকুম মেনে চলা অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয) - এ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সেই সাথে মুজতাহিদ শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তার ক্ষমতা ও এখতিয়ার ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)ও এ বিষয়টি নিয়ে 'ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছেন। তিনি বিচারবুদ্ধির অকাট্য দলীলের সাহায্যে ও কালাম শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত আলোচনাকে বিকশিত করার পর এ বিষয়ের আলোচনাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যার ফলে তা ফিকাহ্ শাস্ত্রের সকল বিভাগের ওপর ছায়া বিস্তার করেছে। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী ও সমকালীন ওলামায়ে ইসলামের সকলেই তাদের ফিকাহর গ্রন্থ সমূহে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর আমরা জানি যে, সাধারণ লোকদের জন্য ফিক্বহী ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের তথা মুজতাহিদগণের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ শুধু জায়েযই নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফরযও বটে।

৩) উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, এক দৃষ্টিকোণ থেকে বেলায়াতে ফকীহ্ একটি কালাম শাস্ত্রীয় বিষয় তথা উছূলে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে এটি হচ্ছে ঐসব বিষয়ের অন্যতম যে সব বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা প্রতিটি লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, এ বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য যে ধরনের বিশেষজ্ঞত্বের প্রয়োজন তারা সে ধরনের বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী নয়। অতএব, এ ব্যাপারে তাদের জন্য অন্য ব্যক্তিদের অনুসরণ অপরিহার্য; তাদেরকে এমন ব্যক্তির অনুসরণ করতে হবে যিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ - যার ওপরে তারা আস্থা রাখতে পারে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে যে নেতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের বিধান রাখা হয়েছে তার কারণও এখানেই নিহিত। জনগণ মুজতাহিদ ফকীহকে চেনার ব্যাপারে এ বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করে থাকে। তাই আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, মুজতাহিদ ফকীহকে চেনা ও তার আনুগত্যের বিষয়টি একটি অনুসরণীয় বিষয়। কারণ, কালাম শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এ বিষয়টি হচ্ছে সেই সব বিষয়ের অন্যতম যে সব বিষয়ে জনগণকে দেখতে হবে যে, যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে তারা কী বলেন। উদাহরণ স্বরূপ, যেহেতু হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেহেতু তাদেরকে এ বিষয়ে তার কথাকে মেনে নিতে হবে। আর যেহেতু মুজতাহিদ শাসকের হুকুম মান্য করা জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য, এ কারণে অথবা মুজতাহিদ শাসকের দায়িত্ব- কর্তব্য কী এবং তার এখতিয়ারের সীমারেখা কতখানি - এগুলো হচ্ছে ফিক্বহী বিষয়, অতএব, এ ব্যাপারে জনগণকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করতে হবে। হ্যা, আমরা মনে করি যে, বেলায়াতে ফকীহ্ দ্বীনের মৌল নীতিমালার (اصول دين) অন্তর্ভুক্ত, তবে তা কোনো স্বতন্ত্র মূলনীতি নয়, বরং তা ইমামতের মূলনীতি থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং তা ইমামতের আওতাধীনেই অবস্থান করছে। মুজতাহিদ শাসক হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর দ্বিতীয় স্তরের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যার অবস্থান মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পরে। বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন ইমামতের ছায়াতলে অবস্থান করছে এবং মুজতাহিদ শাসকের আনুগত্য করার জন্যে কোরআন মজীদেও আদেশ দেয়া হয়েছে; একটি আয়াতে যে, "উলিল্ আমর"- এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মুজতাহিদ শাসকই হচ্ছেন সেই উলিল্ আমর।

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও এটা প্রমাণিত হয় না যে, বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি একটি অনুসন্ধানীয় ও গবেষণা করে গ্রহণ করার বিষয়। এসব আলোচনা থেকে যা প্রমাণিত হয় তার ফলে এ বিষয়টি কালাম শাস্ত্রে আলোচ্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু কোনো বিষয় 'ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয় হওয়ার মানেই এ নয় যে, তা অনিবার্যভাবেই গায়রে তাক্বলীদী[২১] হবে। বস্তুতঃ এ বিষয়টিকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের কতক বিষয়ের সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হলে তার ফলে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট

হবে এবং এর ফলে, উপস্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর ও সমস্যাবলীর সমাধানও অধিকতর সুস্পষ্ট হবে।

বিচারবুদ্ধির দলীল কি বেলায়াতে ফকীহর যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম?

জবাবঃ বেলায়াতে ফকীহ্ বা পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের শাসন- কর্তৃত্ব প্রমাণের জন্য যে সব দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় তা দুই ধরনের ঃ বিচারবুদ্ধির দলীল ও উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল। বারো ইমামী শিয়া মাযহাবের অনুসারী উছূল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে শরীয়তের যে কোনো হুকুম প্রমাণের জন্য অবশ্যই কোনো আয়াত বা কোনো হাদীছের দলীল থাকতেই হবে - এটা অপরিহার্য নয়। বরং বিচারবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় থেকেও ইসলামী ফিকাহর আহকামের মধ্যকার কোনো হুকুম পাওয়া সম্ভব হতে পারে এবং তা প্রমাণ করা যেতে পারে।

এখানে বিচারবুদ্ধির দলীল কথাটির মানে হচ্ছে বিচারবুদ্ধির এমন রায় যার সাহায্যে শরয়ী হুকুমে উপনীত হওয়া সম্ভব। আর বিচারবুদ্ধির রায় সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে শরয়ী হুকুমের জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ কারণেই শিয়া মাযহাবের অনুসারী ওলামায়ে কেরাম বিচারবুদ্ধির রায়কে হুজ্জাত[২২] হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আর বিচারবুদ্ধির রায় যে হুজ্জাত - এটা প্রমাণ করার জন্য তারা 'আক্বল্- এর হজ্জাত হওয়া সম্পর্কিত মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহের দলীল পেশ করে থাকেন। এসব হাদীছ ও রেওয়ায়েত থেকে একটি বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করা হয় এবং এর সাহায্যেই বেহেশত অর্জিত হয়। আর বিচারবুদ্ধির সাহায্যে যে রায় পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষের অন্তর্লোকে বসবাসকারী পয়গাম্বর[২৩] অর্থাৎ 'আক্বল্ - যা তার নিকট এ রায় পৌঁছে দিয়েছে।

অতএব, ফিক্বহী দৃষ্টিতে বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণের জন্য বিচারবুদ্ধির দলীল থেকে সাহায্য গ্রহণের মূল্য কোনো দিক থেকেই উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল অর্থাৎ কোরআন মজীদের আয়াত এবং হাদীছ ও রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করার তুলনায় কম নয়।

বিচারবুদ্ধি যেমন হুকুমাত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাকে অপরিহার্য গণ্য করে, তেমনি ইসলামী সমাজে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ন্যায়বান মুজতাহিদ শাসকের উপস্থিতি এবং ইসলামী হুকুমাতের

শীর্ষ দায়িত্বে তার অবস্থান একটি অপরিহার্য বিষয়। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এ বিষয়ে বিচারবুদ্ধিও রায় প্রদান করে। কারণ, ন্যায়বান মুজতাহিদ শাসক ব্যতীত ইসলামী হুকুমাত কোনো অর্থ বহন করে না।

সনদ ও সনদের দ্বারা প্রতিপন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল সমূহের[২৪] মধ্যে ত্রুটি দেখতে পান তারা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টির প্রতি সমর্থন জানিয়ে থাকেন। তারা বলেনঃ একটি ইসলামী সমাজে দ্বীনী আহকাম বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি হবেন এমন একজন ফকীহ্ যিনি ফিক্বহী তথ্যসূত্রাদি চিহ্নিত করতে এবং তা ব্যবহার করে সকল বা অধিকাংশ শরয়ী আহকাম এবং ইসলামের সাধারণ বিধি- বিধান নির্ণয় করতে সক্ষম।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থে বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় যেগুলোর যথার্থতার সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকাই যথেষ্ট; এজন্য দলীল- প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপনের তেমন একটা প্রয়োজন নেই। এর মানে হচ্ছে এই যে, যে কেউ ইসলামের 'আক্বায়েদ ও ইসলামী আহকাম সম্পর্কে এমনকি মোটামুটি ধারণার অধিকারী থাকলেও, যখনই বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টিতে উপনীত হয় তখনি সে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আর সাথে সাথেই সে তার সত্যতা ও যথার্থতায় উপনীত হয় এবং এ বিষয়টিকে একটি অপরিহার্য ও স্বতঃপ্রমাণিত বিষয় রূপে দেখতে পায়।"

অন্যদিকে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব প্রমাণের জন্যে অত্যন্ত সুদৃঢ় উদ্ধৃতিযোগ্য দলীলও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু যারা উদ্ধৃতিযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করতে আপত্তি করেন তাদের আপত্তির জবাবে তিনি তার আল- বাই' (البيع) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় মন্তব্য করেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে (বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে) অপরিহার্য বিষয় সমূহের অন্যতম; এজন্য কোনো ধরনের যুক্তি ও দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয় না।"

মরহূম আয়াতুল্লাহ্ আল- 'উযমা বুরুজার্দীও বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণের জন্য বিচারবুদ্ধির দলীলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি তার "আল- বাদরুয যাহেরফী ছালাতিল্ জুমু'আতে ওয়াল্ মুসাফের" গ্রন্থের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "সামগ্রিকভাবে (বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে) নিঃসন্দেহে ন্যায়বান ফকীহ্ জনগণ জড়িত এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে নিয়োজিত, আর এ বিষয়টি (বেলায়াতে ফকীহ্) প্রমাণের জন্য ওমর বিন হানযালাহর "মাক্বুলাহ্" হিসেবে বিখ্যাত রেওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য নয়, যদিও উক্ত রেওয়ায়েতও এক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টির সপক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

বিচারবুদ্ধির অকাট্য দলীল মানুষের জন্য খোদায়ী আইন- কানুন ও সামাজিক নেতৃত্বের অপরিহার্যতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বিচারবুদ্ধির অকাট্য দলীল ইসলামী সমাজের জন্য শৃঙ্খলাকে অপরিহার্য গণ্য করে এবং একই কারণে তা দ্বীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। বিচারবুদ্ধির যে অকাট্য দলীল নবুওয়াত ও ইমামতের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে সেই অভিন্ন দলীলই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে মানব সমাজের জন্য এমন একজন ব্যক্তির দাবী করে যিনি হবেন ইসলামী আইন- কানুনে বিশেষজ্ঞ, মুজতাহিদ ও আমানতদার - যিনি ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং ইসলামী আইন- কানুন বাস্তাবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। সে ব্যক্তি হবেন পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ। বিচারবুদ্ধির এ দলীল পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের শাসন- কর্তৃত্বের মূলনীতিকে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

অতঃপর প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোন্ মুজতাহিদ সমাজের শাসন- কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দায়িত্ব হচ্ছে কোনো একজন সুনির্দিষ্ট মুজতাহিদ ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করা। আর তাদের সে সাক্ষ্য সাধারণ জনগণের জন্য অকাট্য দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে। জনগণের উচিৎ হবে তাকেই সর্বাধিক জ্ঞানী, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী ও সুযোগ্যতম মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করা। তবে এর মানে এ নয় যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত মুজতাহিদকে

শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, মুজতাহিদ শাসক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত; বিশেষজ্ঞগণ তাকে খুঁজে বের করেন ও চিহ্নিত করেন মাত্র। আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞত্বের কারণে তারা যখন তাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তখন তারই সাক্ষ্য দেন এবং তাকে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসক হিসেবে সমাজের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন। বিচারবুদ্ধিও এ পন্থাটিকে গ্রহণ করে এবং সমাজের মানুষের জন্য এ ধরনের মুজতাহিদ শাসকের আদেশ- নিষেধ মেনে চলাকে অপরিহার্য গণ্য করে। উদ্ধৃতিযোগ্য বিভিন্ন দলীলেও বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টিকে এমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এর ফলে সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী মানুষ বিচারবুদ্ধিজাত দলীল ও উদ্ধৃতিযোগ্য দলীলের রায়ের ভিত্তিতে বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয় এবং মুজতাহিদ শাসকের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে থাকে।

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসনের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য কেবল বিচারবুদ্ধির দলীলই যথেষ্ট। আর সে দলীল এমন পর্যায়ের যে, যারা এ বিষয়টিকে মেনে নিতে আপত্তি করেন বিচারবুদ্ধির দলীল তাদেরকে তার (বিচারবুদ্ধির দলীলের) সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং তাদেরকে মুজতাহিদ শাসকের আনুগত্য ও অনুসরণে আগ্রহী করে তোলে। এ কারণেই, যারা বেলায়াতে ফকীহকে বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয় বলে মনে করেন এবং বলেন যে, এটি একটি অপরিহার্য বিষয়, তাদের মতে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন হচ্ছে একটি স্বতঃপ্রমাণিত বিষয় এবং এ কারণে তা প্রমাণের জন্য আলাদা কোনো দলীল- প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কারণ, জনগণের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে এবং রাষ্ট্রের জন্য শাসকের প্রয়োজন রয়েছে। আর এ দায়িত্বের জন্য সর্বোত্তম হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি জ্ঞানী, চরিত্রবান, দূরদৃষ্টির অধিকারী ও গুনাহ্ থেকে দূরে অবস্থানকারী। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে যে ব্যক্তি মা'ছূম ইমামের (আ.) অধিকতর নিকটবর্তী, শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব বহনের জন্য তিনি অধিকতর যোগ্য। আর এ ধরনের

ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি মুজতাহিদ, ইসলাম বিশেষজ্ঞ ও তাকওয়ার অধিকারী এবং জনগণ ও সমাজের সামষ্টিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা রাখেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে এ ধরনের ব্যক্তিকে সমাজে ইসলামের সামষ্টিক ও সামাজিক আহকাম বাস্তবায়নের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে সমাজের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া, আর জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের রায়ের অনুসরণে তার আনুগত্য করা, তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য- সহযাগিতা করা ও তার হুকুম মেনে চলা।

কোনো বিচারবুদ্ধিই এর বিপরীতে রায় প্রদান করে না। আর সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায়ের ভিত্তিতে আমাদের যে জ্ঞান হয় তা আমাদেরকে শরয়ী হুকুমে পৌঁছে দেয় এবং সে হুকুম আমাদের জন্য হুজ্জাত বা অকাট্য দলীল। কারণ, বিচারবুদ্ধির রায় এবং বিচারবুদ্ধি আরো যা কিছু পর্যবেক্ষণ করে তা অকাট্য শরয়ী দলীল সমূহের অন্যতম। আর, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বিচারবুদ্ধির রায়ের অকাট্য দলীল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সন্দেহবাদী ধ্যান- ধারণার ও সন্দেহবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ার নিদর্শন মাত্র।

বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণের উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল কী?

জবাবঃ এ বিষয়ে উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল হচ্ছে সেই সব রেওয়ায়েত যাতে বলা হয়েছে যে, সাধারণ জনগণের জন্য তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ফকীহ্ বা মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য অথবা যে সব হাদীছে ফকীহগণকে নবী- রাসূলগণের (আ.) "আমানতের ধারক- বাহক" (أُمناء) , "খলীফাহ্" ও "উত্তরাধিকারী" হিসেবে এবং কর্মদায়িত্বশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা এখানে এসব দলীলের কয়েকটির উল্লেখ করছি ঃ

১) শেখ ছাদূক (রহ্ঃ) তার বিখ্যাত হাদীছ- গ্রন্থ "মান্ লা ইয়াহযুরুল্ ফাক্বীহ্"তে নিম্নোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

قال امير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): اللهم ارحم خلفائى. قيل: يا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذين يروون عنى حديثى و سنتى.

"আমীরুল মু'মিনীন (আ.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ হে আল্লাহ্! আমার খলীফাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তাকে প্রশ্ন করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খলীফাহ্ কারা? তিনি বললেনঃ যারা আমার নিকট থেকে আমার হাদীছ ও আমার সুন্নাত বর্ণনা করে।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার আল- বাই' (البيع) গ্রন্থের ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ "হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর খেলাফত ও স্থলাভিষিক্ততার বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের সূচনা কাল থেকেই সুস্পষ্ট তাৎপর্যের অধিকারী ছিলো এবং এতে কোনো রকমের দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতাই ছিলো না। তখন যদি খেলাফতের বিষয়টি বেলায়াত ও হুকুমাতের বাহ্যিক তাৎপর্য বহন না- ও করে থাকে, তো কম পক্ষে এ তাৎপর্য বহন করতো যে, বেলায়াত ও হুকুমাত হচ্ছে খেলাফতের সুদৃঢ়তম ও সুস্পষ্টতম নিদর্শন।"

হযরত ইমাম তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৭৯ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আলোচ্য হাদীছের উক্তিতে ঐ সব হাদীছ- বর্ণনাকারীকে অন্তর্ভুক্ত গণ্য

করা হয় নি যাদের ব্যাপারে কাতেব বা লিপিকার কথাটি প্রযোজ্য। কারণ, একজন লেখক বা লিপিকার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর খলীফাহ্ হতে পারেন না, বরং এখানে খলীফাহ বলতে ফকীহগণকে বুঝানো হয়েছে।"

হযরত ইমাম তার একই গ্রন্থের ৮১ নং পৃষ্ঠায় একই আলোচনার ধারাবাহিকতায় লিখেছেনঃ "অতএব, উক্ত হাদীছ থেকে যে বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণিত হয় এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ করা উচিৎ নয়। কারণ, এখানে খেলাফত মানে নবুওয়াতের সকল দিককে শামিলকারী স্থলাভিষিক্ততা।"

২) এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে যে রেওয়ায়েতটি বিশেষভাবে বিখ্যাত তা "তাওক্বী' শারীফ" নামে সর্বাধিক সুপরিচিত। মরহূম শেখ ছাদূক তার লেখা "আকমালুদ্ দীন্" গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩) এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন। ইসহাক বিন ইয়াকুব হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর নিকট একটি পত্র লিখেন এবং তাতে তার নিকট জানতে চান ঃ হযরত ইমামের (আ.) দীর্ঘ আত্মগোপনের যুগে যে সব ঘটনা সংঘটিত হবে এবং যুগ জিজ্ঞাসার উদয় হবে সে সবের বেলায় আমাদের করণীয় কী?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এ প্রশ্নের জবাবে ইসহাক বিন ইয়াকুবকে লিখে পাঠান ঃ

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم.

"আর উদ্ভূত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট গমন করো, কারণ, তারা হচ্ছেন তোমাদের ওপর আমার হুজ্জাত এবং আমি তাদের ওপর আল্লাহর হুজ্জাত।"

এখানে 'উদ্ভূত ঘটনাবলী' (الحوادث الواقعة) বলতে আভিধানিক দৃষ্টিতে কোনোভাবেই শরয়ী আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকে বুঝানো হয় নি। বরং ইসহাক বিন ইয়াকুবের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে সংঘটিতব্য সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও ইসলামী সমাজে উদ্ভবনীয় সমস্যাবলী।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "রেওয়ায়েতে বর্ণিত 'উদ্ভূত ঘটনাবলী' (الحوادث الواقعة) বলতে শরয়ী আহকাম সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীকে বুঝানো হয় নি। বরং এর দ্বারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগের অভূতপূর্ব সামাজিক ঘটনাবলী এবং জনগণ ও মুসলমানদের সমস্যাবলীর কথা বুঝানো হয়েছে।"

মরহূম শেখ আনছারী তার 'মাকাসেব' গ্রন্থের ১৫৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ উক্ত হাদীছে যা বলা হয়েছে তা থেকে বুঝতে পারি যে, এ রেওয়ায়েতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি।"

ইতিপূর্বে যেমন আভাস দেয়া হয়েছে উক্ত রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীগণও হচ্ছেন ইসলামের ফকীহ্। হাদীছ বর্ণনাকারীকে অবশ্যই হুজ্জাত ও কোনো নির্ভরযোগ্য শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে তার রেওয়ায়েতকে মা'ছূম ইমাম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হতে হবে। এ বিশেষজ্ঞত্ব ফিকাহ্ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামের ফকীহগণ তথা মুজতাহিদগণ এ বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী।

আয়াতুল্লাহ্ মা'রেফাত[২৫] ও এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৭৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "উক্ত রেওয়ায়েতে বর্ণিত حجتى عليكم কথার অর্থ হচ্ছে মা'ছূম ইমাম (আ.)- এর নিরঙ্কুশ বেলায়াতের অনুরূপ।"

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, অত্র রেওয়ায়েত থেকেও বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণিত হয়। কারণ, এর বর্ণনাকারীরাও হচ্ছেন সেই মুজতাহিদ ও ওলামায়ে দ্বীন। তারা হচ্ছেন সেই ফকীহ্ বা মুজতাহিদ যারা মা'ছূম ইমাম (আ.)- এর এখতিয়ারের নিরঙ্কুশ শাসন- কর্তৃত্বের অধিকারী।"

৩) ওমর বিন হানযালাহ্ কর্তৃক হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত। এ রেওয়ায়েতটি সকলের নিকটই গৃহীত হয়েছে, যে কারণে এটি 'রেওয়ায়েতে মাক্ববুলাহ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আল্লামা হুর 'আমুলী[২৬] তার "ওয়াসায়েলুশ্ শী'আহ্" গ্রন্থে (১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৯৮) লিখেছেনঃ ওমর বিন হানযালাহ্ বলেনঃ

“শিয়াদের মধ্যকার দু’জন লোক - যাদের মধ্যে ঋণ বা মীরাছ নিয়ে বিরোধ ছিলো এবং তারা সমকালীন শাসক কর্তৃক নিয়োজিত বিচারকের নিকট ফয়সালার জন্য গিয়েছিলো, তাদের ব্যাপারে ইমাম সাদেক (আ.)কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাদের এ কাজ কি বৈধ ছিলো?

“জবাবে ইমাম বললেনঃ যে ব্যক্তিই যথার্থ দাবী বা মিথ্যা দাবী নিয়ে তাদের কাছে যায়, প্রকৃত পক্ষে সে তাগূতের কাছে অর্থাৎ অবৈধ শাসকের কাছে গেলো এবং তাদের রায়ের ভিত্তিতে সে যা কিছু গ্রহণ করলো, প্রকৃত পক্ষে সে তা হারাম পন্থায় গ্রহণ করলো, যদিও সে যা গ্রহণ করলো তা তার অকাট্য অধিকার হয়ে থাকে। কারণ, সে তা তাগূতের রায়ের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে, অথচ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা সূরাহ্ নিসা- র ৬০ নং আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

(يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به).

“তারা বিচার- ফয়সালা পাওয়ার জন্যে তাগূতের কাছে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।”

“ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তাহলে এই দুই ব্যক্তি তাদের মধ্যকার বিরোধের ব্যাপারে কী করবে?

“ইমাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করে এবং আমাদের দৃষ্টিতে যা হালাল ও হারাম সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং আমাদের আহকামের সাথে ভালোভাবে পরিচিত, তার কাছে যাবে এবং তার হুকুমকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে।

(ইমাম বলেনঃ)

فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلن يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و الراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرک بالله.

“অবশ্যই আমি তাকে তোমাদের ওপর শাসক ও বিচারক নিয়োগ করেছি। অতএব, সে যখন আমাদের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করে তখন যে ব্যক্তি তা গ্রহণ না করে সে আল্লাহর ফয়সালাকে গুরুত্বহীন গণ্য করলো এবং আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো, আর আমাদেরকে

প্রত্যাখ্যানকারী আল্লাহকে প্রত্যাখ্যানকারীর সমতুল্য এবং তার সে কাজ আল্লাহর সাথে শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত।"

এটা সুস্পষ্ট যে, ইমাম (আ.) যেখানে বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করে এবং আমাদের দৃষ্টিতে যা হালাল ও হারাম সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং আমাদের আহকামের সাথে ভালোভাবে পরিচিত" (قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و عرف احكمنا) সেখানে শরীয়াতের আহকাম ও দ্বীনী বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ ফকীহ্ ও মুজতাহিদ ছাড়া আর কাউকে বুঝাতে চান নি। কারণ, অন্য কারো ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে না। অতএব, সন্দেহাতীতভাবেই হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ফকীহ্ ও ওলামায়ে দ্বীনকে জনগণের ওপর শাসক ও বিচারক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ফকীহর ফয়সালাকে তার নিজের ফয়সালা হিসেবে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য যে, মাছূম ইমাম (আ.)- এর হুকুম মেনে চলা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব, ফকীহর ফয়সালা মেনে নেয়া ও তার আনুগত্য করাও ফরয।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১২২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, ইমাম (আ.) ফকীহগণকে হুকুমাত ও বিচারকার্যের জন্যে মনোনীত করেছেন। আর সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য ইমাম (আ.)- এর আদেশ মেনে চলা অপরিহার্য।"

আয়াতুল্লাহ্ ইউসুফ ছানে'ঈ[২৭] তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১২৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "আমার মতে এ রেওয়ায়েতটি হচ্ছে ঐ সব রেওয়ায়েতের অন্যতম যা ফকীহর জন্য শাসন- কর্তৃত্ব নির্ধরণ করে দিয়েছে। এ ছাড়াও এ রেওয়ায়েতে এ জাতীয় অন্যান্য রেওয়ায়েতের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুও আছে। তা হচ্ছে, এমনকি ব্যক্তির যদি দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, ফকীহ্ ভুল করছেন তা সত্ত্বেও ব্যক্তির জন্য ফকীহর হুকুমের আনুগত্য করা ও তার আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য। ওমর বিন হানযালাহর বর্ণিত 'সর্বজনগৃহীত' (مقبولة) রেওয়ায়েতের এটিই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"

আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী অমোলী[২৮] ও এ বিষয়টিকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "বিশ্লেষণ ও গবেষণা শক্তির অধিকারী হাদীছ বর্ণনাকারী অর্থাৎ যিনি ফিকহী বিষয়ে মতামত দানের যোগ্যতা রাখেন এবং তিনি ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত ব্যক্ত করেন অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর উত্তরাধিকারী আলেমে দ্বীন, তিনি একদিকে যেমন জনগণের (বিরোধীয় বিষয়াদির) বিচারক, তেমনি তিনি শাসকও বটে।"

উপরোক্ত রেওয়ায়েতে যেভাবে তাগূত এবং স্বৈরাচারী জালেম শাসকের ও তার নিয়োজিত বিচারকের নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি তার বিকল্প হিসেবে বৈধ শাসক ও বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে - যাতে উক্ত নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানও সম্ভব হয়।

আয়াতুল্লাহ্ তাকী মেসবাহ্ ইয়াযদী[২৯] তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ " جعلته عليكم قاضياً (তাকে তোমাদের ওপর বিচারক নিয়োগ করেছি) না বলে এই যে বলা হয়েছে جعلته عليكم حاكما (তাকে তোমাদের ওপর শাসক নিয়োগ করেছি - যিনি বিচারকও বটে), এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে حاكم শব্দটি অনেক বেশী ব্যাপক অর্থবোধক এবং এতে রাষ্ট্র ও শাসন- কর্তৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজকর্ম ও সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত বুঝায়।"

৪) মরহূম কুলাইনী[৩০] তার "উছূলে কাফী" গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেছেনঃ الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا - "ফকীহ্গণ নবী- রাসূলগণের আমানত বহনকারী যতক্ষণ না দুনিয়ায় প্রবেশ করে।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! এখানে দুনিয়ায় প্রবেশের মানে কী? তিনি এরশাদ করলেনঃ শাসকদের আনুগত্য ও অনুসরণ। যখনই তারা রাজা- বাদশাহদের ও শক্তি- ক্ষমতার অধিকারীদের অনুসরণ করবে তখন নিজেদের দ্বীনের হেফাযতের লক্ষ্যে তাদেরকে পরিহার করে চলো।"

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) যে ফকীহগণকে নবী- রাসূলগণের (আ.) আমানত বহনকারী বলে উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি তাদের আমানত বহনকারী হওয়ার বিষয়টিকে কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন নি। তারা সকল বিষয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর আমানত বহনকারী। ফকীহগণ আল্লাহ্ তা'আলার আইন- কানুনের ব্যাপারে, উক্ত আইন- কানুন কার্যকর করণের ব্যাপারে ও জনগণের মধ্যে বিচার- ফয়সালা করার ব্যাপারে তথা খোদায়ী আইনের বাস্তব রূপায়নের ব্যাপারে নবী- রাসূলগণের (আ.) আমানতের বহনকারী।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৯২ নং পৃষ্ঠায় الفقهاء امناء الرسل হাদীছ প্রসঙ্গে বলেনঃ "অর্থাৎ নবী- রাসূলগণের (আ.) যত রকমের দায়িত্ব- কর্তব্য ছিলো ন্যায়পরায়ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ফকীহগণ তার সব কিছুই আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল। অতএব, امناء الرسل হচ্ছেন তারাই যারা (দ্বীন ও শরীয়তের) কোনো হুকুমই লঙ্ঘন করবেন না এবং গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবেন।"

৫) মরহুম কুলাইনী তার "উছূলে কাফী" গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর সূত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। এতে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেনঃ "ان العلماء ورثة الانبياء. - "নিঃসন্দেহে আলেমগণ নবী- রাসূলগণের উত্তরাধিকারী।" এ হাদীছের ধারাবাহিকতায় নবী করীম (সা.) আরো এরশাদ করেনঃ "নবী- রাসূলগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার ও দেরহাম রেখে যান নি; তারা উত্তরাধিকার হিসেবে জ্ঞান রেখে গেছেন। অতএব, যে তা অর্জন করলো সে বিরাট প্রাচুর্যের অধিকারী হলো।"

উপরোক্ত হাদীছে ওলামা বলতে বিশেষভাবে মা'ছূম ইমামগণ (আ.)- কে বুঝানো হয় নি। বরং এতে যে, মা'ছূম ইমামগণ (আ.) ছাড়া অন্যদেরকেও শামিল করা হয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর নবী- রাসূলগণ (আ.)- এর মূল দায়িত্ব- কর্তব্য ছিলো জনগণের সামষ্টিক কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়া ও নিয়ন্ত্রণ করা যার মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক তথা সকল বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরাম নবী- রাসূলগণ (আ.)- এর এসব দায়িত্বের এবং ইসলামী

সমাজ ও সমষ্টির নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের উত্তরাধিকারী। বস্তুতঃ নবী ও রাসূল পরিভাষার যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বান্দাহেদর কাছে পৌঁছে দেয়া, তা ছাড়াও এ পরিভাষার ভিতরে সমাজের দিকনির্দেশনা, পরিচালনা, নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের তাৎপর্যের প্রতিও ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। একজন নবী একদিকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ওহী লাভ করেন, অন্যদিকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ- নিষেধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী লাভ করার ও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী সে হিসেবে তিনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ওলী-আল্লাহ্, অন্যদিকে যেহেতু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আহকাম কার্যকর ও বাস্তবায়ন করেন এবং ইসলামী উম্মাহর সামষ্টিক বিষয়াদি পরিচালনা করেন সে দিক থেকে তিনি 'মুসলমানদের কর্মসম্পাদনের অভিভাবক বা শাসক' (ولى امر مسلمين) ।

একজন ফকীহ্ বা মুজতাহিদ নবী- রাসূলগণ (আ.)- এর এসব দায়িত্বেরই উত্তরাধিকার লাভ করে থাকেন। ফরয কাজ সমূহ, হালাল ও হারাম, কিছাছ, হুদূদ, তা'যিরাত, জিহাদ, প্রতিরক্ষা ও এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান নবী- রাসূলগণ (আ.)- এর পক্ষ থেকে ফকীহগণের নিকট স্থানান্তরিত হয়। এ থেকে তদনুযায়ী আমল করা ও তা কার্যকর করা এবং এসব আহকাম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, এসব নির্বাহী ও প্রশাসনিক বিধি- বিধানের উত্তরাধিকার সেগুলোর কার্যকর করণ ও বাস্তবায়ন ছাড়া একদমই অর্থহীন। অতএব, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই যে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর ওপর এসব আহকাম নাযিল হয়েছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। ঠিক সেভাবেই বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তা তার উত্তরাধিকার হিসেবে ওলামায়ে দ্বীন ও মুজতাহেদীনে কেরামের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কোরআন মজীদ ও হাদীছের সূত্রে এসব আহকামের জ্ঞান লাভ করার পর তা বাস্তবায়ন করা তাদের দায়িত্ব। অতএব, যে সব আহকামে দ্বীন স্বয়ং নবী- রাসূলগণের (আ.) যুগে তদনুযায়ী আমল করা ও কার্যকর করার জন্য বলে পরিগণিত হতো, বর্তমানে নবী- রাসূলগণের (আ.) পরবর্তী যুগে তা

কার্যকর করণের দায়িত্ব তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে ওলামায়ে দ্বীন ও মুজতাহেদীনে কেরামের। তাই তারা এখন তাদের 'ইল্মেক আমলে তথা জ্ঞানকে কাজে পরিণত করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ১৩৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ " العلماء ورثة الانبياء (আলেমগণ নবী- রাসূলগণের উত্তরাধিকারী) - এ কথাটিকে যদি 'সর্বজনীনভাবে প্রচলিত' (عرف) অর্থে বিবেচনা করি ... এবং প্রচলিত অর্থেই সাধারণ মানুষের নিকট প্রশ্ন করি যে (উক্ত হাদীছের আলোকে) অমুক ফকীহ্ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)- এর অবস্থানের অধিকারী কিনা? তাহলে তারা জবাব দেবে ঃ উক্ত হাদীছ অনুযায়ী, হ্যা। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) নবী- রাসূলগণের (আ.) অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমরা 'নবী- রাসূলগণ' (الانبياء) কথাটিকে কেবল খেতাব বাচক অর্থে গ্রহণ করতে পারি না, বিশেষ করে যেহেতু শব্দটি বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি শব্দটি এক বচনে ব্যবহার করা হলেও তা থেকে একই অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো, কিন্তু যখন বহু বচন ব্যবহৃত হয়েছে তখন এতে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নবী- রাসূল (আ.)ই শামিল রয়েছেন।"

আমরা যদি এ হাদীছে "আম্বিয়া" শব্দের ব্যবহারকে স্রেফ সম্মানসূচক খেতাব বাচক বলে গ্রহণ করতাম তাহলে এ থেকে ওলামায়ে কেরাম ও মুজতাহিদগণের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব প্রমাণিত হতো না। কিন্তু কথাটির সাধারণ ও 'সর্বজনীনভাবে প্রচলিত' (عرف) অর্থ অনুযায়ী ফকীহ্ বা মুজতাহিদের অবস্থান হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)- এর অবস্থানের পর্যায়ভুক্ত। আর যেহেতু তাদের যে সব মর্যাদা, দায়িত্ব- কর্তব্য এবং ক্ষমতা ও এখতিয়ার ছিলো তার মধ্যে নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব (বেলায়াত) অন্যতম, সেহেতু ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে মুজতাহিদগণের অন্যতম মর্যাদা হচ্ছে উক্ত বেলায়াতের মর্যাদা। এ বেলায়াত হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে মা'ছূম ইমামগণের (আ.) নিকট এবং তাদের মাধ্যমে ফকীহ্ বা মুজতাহিদগণের নিকট পৌঁছেছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.) বলেনঃ العلماء حكام على الناس. - "আলেমগণ হচ্ছেন জনগণের ওপর নিয়োজিত শাসক।"

এ হচ্ছে বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র। এ সংক্রান্ত সকল হাদীছ ও রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা এ গ্রন্থের সীমিত আয়তনে সম্ভব নয় এবং তা হয়তো পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তির কারণ হবে। তবে এ সীমিত সংখ্যক হাদীছ ও রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করি। কারণ, কথায় বলে ঃ ঘরে কোনো লোক আছে কিনা তা বুঝার জন্য এক অক্ষর উচ্চারণই যথেষ্ট।

বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্ব প্রমাণের জন্য বিচারবুদ্ধি যে দলীল উপস্থাপন করে তার সত্যতার বিষয়টিকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্যে উপরোক্ত হাদীছ ও রেওয়ায়েত সমূহই যথেষ্ট। বিচারবুদ্ধির দলীল ও উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল - এ উভয় ধরনের দলীল থেকে বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণিত হবার ফলে এ ব্যাপারে সংশয় ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বের আর বিন্দুমাত্রও অবকাশ থাকে না, বরং প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়।

বেলায়াতে ফকীহ্ প্রশ্নে অতীত- বর্তমান আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরাম বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব গ্রহণ করেন নি ধারণায় অনেকে তা প্রত্যাখ্যান ও এর চৈন্তিক ভিত্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন; প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

জবাবঃ হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তার 'হুকুমাতে ইসলামী' গ্রন্থের ৩ নং ও ১৭২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "বেলায়াতে ফকীহর বিষয়টি কোনো নতুন বিষয় নয় যে, আমরা তা উদ্ভাবন করে থাকবো, বরং এ বিষয়টি শুরু থেকেই একটি আলোচ্য বিষয় ছিলো। তামাক বর্জনের জন্যে মীর্যায়ে শীরাযী যে আদেশ জারী করেছিলেন প্রকৃত পক্ষে তা ছিলো একটি রাষ্ট্রীয় আদেশেরই অনুরূপ এবং তার অনুসরণ অন্যান্য ফকীহগণের জন্যও ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য ছিলো। তৎকালে অল্প কয়েক জন বাদে ইরানের ওলামায়ে কেরামের সকলেই এ আদেশের অনুসরণ করেন। এটা কোনো বিচার বিষয়ক বিষয় ছিলো না, যে সম্পর্কে কয়েক জন লোকের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিলো এবং তারাও তাদের জ্ঞান- বিবেচনা অনুযায়ী রায় প্রদান করেছিলেন। বরং এর সাথে মুসলিম জনগণের স্বার্থ জড়িত ছিলো এবং তারা রাষ্ট্রীয় আদেশ জারী করার ন্যায় এ রায় ঘোষণা করেছিলেন। ফলে যদ্দিন মূল প্রসঙ্গটি বিদ্যমান ছিলো তদ্দিন এ রায়ের কার্যকরিতাও ছিলো এবং মূল সমস্যাটি দূরীভূত হয়ে যাবার পর তারা তাদের রায়ে ঘোষিত আদেশও তুলে নেন।

"মরহূম মীর্যা মোহাম্মাদ তাকী শীরাযী যখন জিহাদের আদেশ দেন - যদিও তার নাম দেয়া হয় প্রতিরক্ষা, তখন ওলামায়ে কেরামের সকলেই তার অনুসরণ করেন। কারণ, এটি ছিলো একটি হুকুমাত সংশ্লিষ্ট আদেশ।

"(বিভিন্ন সূত্রে) যেমন উদ্ধৃত হয়েছে, মরহূম কাশেফুল গ্বেত্বা'- ও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। ... পরবর্তীকালীন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মরহূম নারাক্বী ফকীহগণকে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সকল দায়িত্ব- কর্তব্য ও অধিকারের অধিকারী বলে মনে করেন।

মরহূম নায়ীনীও বলেন যে, ওমর বিন হানযালাহ্ বর্ণিত 'মাক্বুলাহ্' হিসেবে খ্যাত রেওয়ায়েত থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

"মোদ্দা কথা, এ্ সংক্রান্ত আলোচনা নতুন কিছু নয়। আমরা এ বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনা করেছি এবং এর হুকুমাত সংক্রান্ত দিকটির কথা উল্লেখ করে তা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যাতে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর যবানীতে যা এরশাদ করেছেন সেই সাথে আমরা যুগের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কিছু বিষয় যোগ করেছি, নচেৎ বিষয়টি তা- ই যা আরো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।"

হযরত ইমামের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত আলোচনা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়; কোনো নতুন বিষয় নয়।

আয়াতুল্লাহ্ ছানে'ঈ তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৩০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "আমরা যদ্দূর জানি, দুয়েক জনের বেশী বলেন নি যে, ফকীহ্ কিছুতেই বেলায়াতের অধিকারী নন।"

মরহূম নারাক্বী এ ব্যাপারে এর চেয়েও দৃঢ়তর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, এ বিষয়ে ইজমা' রয়েছে। তিনি বলেনঃ "মোদ্দা কথা, বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে শিয়া মাযহাবের (অনুসারী ওলামায়ে কেরামের) মধ্যে ইজমা' রয়েছে। এজমালীভাবে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন নি।"

আয়াতুল্লাহ্ শেখ জা'ফর কাশেফুল গ্বেত্বা তার "কাশফুল্ গ্বেত্বা" গ্রন্থে, শহীদ মোদাররেস তার "উছূলে তাশ্কীলাতে 'আদিলআহ্" গ্রন্থে ও আয়াতুল্লাহ্ ফাযেল তার "খাযায়েনুল আহকাম" গ্রন্থে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এছাড়া শেখ তুসী[৩১], সাইয়েদ মোরতাযা ও মোকাদ্দাস আরদেবিলী[৩২] তাদের নিজ নিজ ফিকাহর কিতাবে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। মরহূম সাবযেভারী তার "কেফায়াতুল্ আহকাম" গ্রন্থের ৮৩নং পৃষ্ঠায় বেলায়াতে ফকীহর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা পেশ করেছেন।

সমকালীন মুজতাহিদগণের মধ্য থেকে আয়াতুল্লাহ্ আল- 'উযমা বোরুজারদী মুজতাহিদ শাসকের জন্য ব্যাপক এখতিয়ারের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি মুজতাহিদের ব্যাপক এখতিয়ার প্রয়োগ করে কোমে এমন একটি রাস্তা নির্মাণের অনুকূলে মত প্রদান করেন যা করতে গিয়ে অনেক বাড়ীঘর ভাঙ্গতে হয়েছিলো। শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোরতাযা মোতাহহারী[৩৩] তার লেখা "ইসলাম ও মোক্বতাযিয়াতে যামান" (ইসলাম ও যুগের দাবী) শীর্ষক গ্রন্থে (২য় খণ্ড পৃঃ ৮৪) লিখেছেনঃ "জনাব বোরুজারদী বলেছিলেন, যদি মসজিদ ভাঙ্গতে না হয় তো বাধা নেই; এ কাজ সম্পাদন করুন এবং মালিকদের সম্পদের মূল্যও তাদেরকে প্রদান করুন।"

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আয়াতুল্লাহ্ আল- 'উযমা বোরুজারদী তার "আল- হিদায়াতু ইলা মান্ লাহুল্ ভিলাইয়্যাহ্" (বেলায়াতের অধিকারীর জন্য পথনির্দেশ) গ্রন্থে বেলায়াতে ফকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'ছাহেবে জাওয়াহের' নামে সমধিক পরিচিত আল্লামা শেখ হাসান নাজাফী স্বীয় গ্রন্থের ২১তম খণ্ডের ৩৯৭ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "কেউ যদি স্বীয় ফিকহী চিন্তা- গবেষণায় এমন এক উপসংহারে উপনীত হন যার ফলে তিনি ফকীহর জন্য সর্বজনীন বেলায়াত ও হুকুমাতের বিষয়টি অস্বীকার করেন তো নিঃসন্দেহে এ ধরনের লোকেরা ফিকাহর আস্বাদন করেন নি এবং মা'ছূমগণের (আ.) কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি।"

ছাহেবে জাওয়াহের অন্যত্র বলেনঃ "আছহাব অর্থাৎ ইমামিয়া ফকীহগণের বাহ্যিক আমল ও ফতোয়া হচ্ছে এই যে, তারা বেলায়াতে ফকীহর সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতায় বিশ্বাসী এবং একে অকাট্য বিষয়, বরং অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন।

শেখ আনছারী যদিও তার "মাকাসেব" গ্রন্থে ওলীয়ে ফকীহর এখতিয়ার ও দায়িত্ব- কর্তব্যকে সীমিত বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু তিনি তার যাকাত, খুমস, ইবাদতকারীর মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টি প্রমাণের জন্য দলীল উপস্থাপন করেছেন।

তিনি 'হাকেম' বা শাসক বলতে বিচার ও শাসন ক্ষমতার সমন্বিত ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মনে করেন। এরপর তিনি বলেনঃ "ফকীহগণ যে বিচারকার্যের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত এ ব্যাপারে

সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটা অসম্ভব নয় যে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটা অপরিহার্য পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকবে। হয়তো এর মূল ভিত্তি হচ্ছে ওমর বিন হানযালাহর 'মাক্বুলাহ্' . . . ও আবি খাদীজাহর 'মাশহূরাহ্' (বিখ্যাত হাদীছ) ... এবং সমুন্নত তাওক্বী' . . . । পূর্বে উল্লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বাহ্যিক তাৎপর্য অনুযায়ী ফকীহর রায়ে শরয়ী আহকামের সকল বৈশিষ্ট্যই নিহিত রয়েছে, . . . কারণ, "হাকেম" (حاكم - শাসক) শব্দটি ব্যবহারের ফলে এটাই বুঝায় যে, তিনি নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। ... এটা এর সর্বজনীনতাই প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ এখানে "বিচারক" (حَكَم) শব্দ ব্যবহার না করে "হাকেম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর বাক্যের ধারাবাহিকতায় যে বলা হয়েছে, 'সে যা হুকুম দেয় তা মেনে নাও' - এর দ্বারা কার্যতঃ বলতে চাওয়া হয়েছে যে, তাকে আমি ফয়সালাকারী (حَكَم) নিয়োগ করেছি।"

শেখ আনছারী তার কিতাবুল্ ক্বাযা'য় এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছেন, যা তার কিতাবুল্ বাই'- এ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে তিনি যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ঃ ১) সুস্পষ্ট ভাষায় মাক্বুলাহ্ রেওয়ায়েতের সনদের নির্ভরযোগ্যতা ও তার হুজ্জাত হওয়ার স্বীকারোক্তি, ২) পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদের হুকুমের সর্বজনীন বা সর্বাত্মক কার্যকরিতার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং ৩) বিচারক বা ফয়সালাকারী (حَكَم) শব্দের সাথে ব্যাপক অর্থবোধক "হাকেম" (حاكم) শব্দটির সম্পর্ক।

শেখ আনছারী তার 'মাকাসেব্' গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৪) লিখেছেনঃ "বিখ্যাত ফকীহগণ বেলায়াতে ফকীহতে বিশ্বাস পোষণ করেন।" তিনি আরো লিখেছেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫) ঃ "আছহাব (অর্থাৎ ইমামিয়া ফকীহগণ)- এর মধ্যে বেলায়াতে ফকীহ্ একটি বিখ্যাত আলোচ্য বিষয়।"

যে সব ফকীহ্ বেলায়াতে ফকীহ্ সম্বন্ধে সুবিন্যস্ত ও প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে মরহূম নারাক্বী অন্যতম। তিনি তার 'আওয়াদুল আইয়াম্ গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৭) লিখেছেনঃ "জনগণের ওপর শাসন- কর্তৃত্ব পরিচালনা ও ইসলামের হেফাযতের অধিকারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও

মা'ছূম ইমামগণ (আ.) জনগণের ওপর যে অধিকার রাখতেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে ফকীহগণ সেই একই এখতিয়ারের অধিকারী, যদি না পঠনীয় দলীল (نص) বা ইজমা' দ্বারা কোনো কিছু এই সর্বজনীন ও সর্বাত্মক এখতিয়ারের বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়। তেমনি জনগণের দ্বীন ও দুনিয়ার হেফাযতের জন্য এবং সমাজ ব্যবস্থার জন্য যে সব বিষয় বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং শরীয়ত যে সব কাজের আঞ্জাম হওয়া দাবী করে, কিন্তু সে জন্য বিশেষ কাউকে সম্বোধন করে নি বা দায়িত্ব দেয় নি, তা আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব ফকীহর। তিনি এসব কাজের সবগুলোর দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার বা তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই।"

মরহূম আরদেবিলী তার "মাজমা'উল্ ফায়েদাহ্ ওয়াল্ বুরহান" গ্রন্থে যাকাত, জিহাদ, বিচারকার্য, সাক্ষ্য, রক্তমূল্য, ব্যবসায়, বন্ধক ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় এসব বিষয়ের আহকাম ও দায়িত্ব- কর্তব্য পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদের বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার এ গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদকে মাছূম ইমামের (আ.) নায়েব বা প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

لانه قائم مقام الامام (عليه السلام) و نائب عنه. - "যেহেতু তিনি ইমাম (আ.)- এর স্থলাভিষিক্ত এবং তার প্রতিনিধি।" অর্থাৎ তার মতে, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে তার সাধারণ ও সার্বিক প্রতিনিধি হিসেবে স্বয়ং ইমাম (আ.)- এর সকল কাজকর্মেরই দায়িত্বশীল। অতএব, তিনি যেমন ফতোয়া দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল ঠিক সেভাবেই আহকাম কার্যকর করার এবং জনগণের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্যেও দায়িত্বশীল।

মরহূম আরদেবিলী তার উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বেলায়াতে ফকীহ্ ও ইসলামী শাসকের দায়িত্ব- কর্তব্য ও এখতিয়ার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে এমন বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন যা থেকে ইসলামী শাসকের এখতিয়ারের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়।

শেখ মুফীদ[৩৪] তার "আল- মাক্বনা'আহ্" গ্রন্থের ৮১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "ইসলামের সুনির্দিষ্ট শাস্তি- বিধান ও শান্তি- শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধি- বিধান কার্যকর করণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়োজিত ইসলামী শাসকের দায়িত্ব। আর এখানে 'শাসক' বলতে আলে মুহাম্মাদের (সা.) সঠিক পথানুসারী ইমামগণ (আ.) অথবা তাদের পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তিগণ। ইমামগণও এ দায়িত্ব শিয়া ফকীহগণের ওপর অর্পণ করেছেন যাতে সম্ভব হলেই তারা যেন তা কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

আল্লামা হিল্লী[৩৫] তার "ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে লিখেছেনঃ "বর্তমান যুগে আইন- শৃঙ্খলা ও সমাজ পরিচালনা সংক্রান্ত আহকাম কার্যকর করণের দায়িত্ব মা'ছূম ইমামের (আ.) বা তার পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তির এবং ইমামের আত্মগোপনরত থাকার যুগে এ দায়িত্ব শিয়া ফকীহগণের।"

শহীদে আউয়াল[৩৬] তার "ইযাহুল্ ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৮) লিখেছেনঃ "আইন- শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধি- বিধান (সুনির্দিষ্ট দণ্ডবিধি ও রাষ্ট্র নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করার দায়িত্ব ইমামের (আ.) ও তার প্রতিনিধির।"

তিনি তার গ্রন্থের ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে এ দায়িত্ব পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদের, আর জনগণ তাকে শক্তির অধিকারী করবে ও তাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে এবং সম্ভব হলে এ দায়িত্ব জবর দখলকারীদেরকে তারা প্রতিহত করবে। আর ফকীহর দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপদ পরিস্থিতি হলে আইনগত মতামত (ফতোয়া) দেবেন এবং জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মতবিরোধীয় বিষয়গুলোকে তার সমীপে পেশ করবে।"

আয়াতুল্লাহ্ মীর ফাত্তাহ্ হোসেনী মারাগ্বেয়ী তার 'আনাভীনুল উছূল্ গ্রন্থে (পৃঃ ৩৫৮) বলেনঃ "ইমাম (আ.) ফকীহকে যে বেলায়াত প্রদান করেছেন, উক্ত বেলায়াতে ফকীহ্ তথা মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্বের সপক্ষের যুক্তি সমূহের অন্যতম হচ্ছে এই যে, যেহেতু শরীয়াতের দৃষ্টিতে ফকীহ্ বেলায়াতের অধিকারী সেহেতু ইমাম (আ.) তাকে বেলায়াত প্রদান করেছেন। অতএব, ইমাম (আ.) কর্তৃক এ দায়িত্ব অর্পণ কার্যতঃ শরয়ী হুকুমের উদঘাটনকারী।"

আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলে বাহ্রুল ‘উলূম্ তার লিখিত “বালাগ্বাতুল্ ফাক্বীহ্” গ্রন্থে বেলায়াত সংক্রান্ত আলোচনায় (পৃঃ ২৯৭) লিখেছেনঃ “যে সব দলীল- প্রমাণ থেকে ফকীহ্ মাছূম ইমাম (আ.)- এর সাধারণ প্রতিনিধি বলে প্রমাণিত হয় তার দাবী হচ্ছে এই যে, ন্যায়বান মুজতাহিদ যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তখন অন্যান্য ফকীহ্‌র পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা জায়েয নয়। কারণ, প্রতিনিধিত্বের দাবী অনুযায়ী, শাসন- কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণকারী ন্যায়বান ফকীহ্‌র বিরোধিতা করা মা‘ছূম (আ.)- এর বিরোধিতার সমতুল্য বলে পরিগণিত হবে।”

মরহূম আল্লামা নায়িনী তার “তান্বিয়াতুল্ উম্মাহ্” গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো এক ব্যক্তি ফকীহ্‌র সর্বজনীন কর্তৃত্ব বা শাসন কর্তৃত্বকে অপরিহার্য গণ্য করেন না; সে ক্ষেত্রেও তার জন্য অ-ফকীহ্‌র যুলুম- অত্যাচার ভিত্তিক হুকুমাতের ওপর ফকীহ্‌র হুকুমাতকে অগ্রাধিকার প্রদান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মরহূম আয়াতুল্লাহ্ আল- ‘উযমা খুয়ী[৩৭] ও বলেনঃ “দ্বীনী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের আইন- শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন- কানুন ও বিধি- বিধানের পিছনে যে সব কারণ নিহিত রয়েছে তা এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। এসব আইন- কানুন ও বিধিবিধানকে বিশেষ যুগ বা বিশেষ অবস্থার সাথে শর্তাধীন করে দেখা সম্ভব নয়। ইসলামের সাথে এসবের এ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দাবী হচ্ছে এই যে, এসব আইনকে সকল যুগেই বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হয়েছে? উল্লিখিত কারণ সমূহ থেকে তা জানা যায় না। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে এসব আইন- কানুন বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয় নি। কারণ, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অন্যদিকে তাওক্বী শরীফে বলা হয়েছে ঃ

“আর উদ্ভূত - .و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم

ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট গমন করো, কারণ, তারা

হচ্ছেন তোমাদের ওপর আমার হুজ্জাত এবং আমি তাদের ওপর আল্লাহর হুজ্জাত।" এছাড়া হাফছ্ বিন গিয়াসের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ اقامة حدود الى من اليه الحكم - "খোদায়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করণের দায়িত্ব তার যে এ বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা রাখে।" অতএব, আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে ইসলামী আইন- কানুন বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপযুক্ত ফকীহগণের।"

আল্লামা তাবাতাবায়ী[৩৮] ১৩৪১ ফার্সী সালে (১৯৬২ খৃস্টাব্দে) "বেলায়াত ভা যা'আমাত্" (বেলায়াত ও শাসন- কর্তৃত্ব) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন যা পরবর্তী কালে তার "বাহাছী র্দাবরে মারজা'ঈয়াত্ ওয়া রূহানিয়্যাত্" (মারজা'ঈয়াত ও ওলামা সংক্রান্ত বিতর্ক) শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি বেলায়াতে ফকীহ্ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "প্রশ্ন হচ্ছে, বেলায়াত কি সকল মুসলমানের, নাকি তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিদের বা ফকীহগণের (আজকের পরিভাষায়)? ইসলামের প্রথম যুগে ফকীহ্ বলা হতো এমন ব্যক্তিকে যিনি দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা, বিস্তারিত বিধিবিধান ও চারিত্রিক শিক্ষা তথা সমগ্র দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী হতেন। বর্তমানে যে কেবল দ্বীনের বিস্তারিত বিধি- বিধান সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিকে ফকীহ্ বলা হয়, তৎকালে তা বলা হতো না। এই তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি সকল ফকীহর দায়িত্ব, নাকি এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বহু সংখ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সকলেরই দায়িত্ব এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করবেন ও তাদের প্রত্যেকেরই হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য ও অনস্বীকার্য? অথবা তা তাদের মধ্যকার সর্বাধিক জ্ঞানী ফকীহর দায়িত্ব? এ হচ্ছে এমন কতগুলো বিষয় যা আমাদের বর্তমান আলোচনার আওতা বহির্ভূত এবং ফিকাহর আলোচনায় এ সব প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে। অত্র প্রবন্ধের আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে যে উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে, মানবিক প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী প্রতিটি সমাজের জন্য একটি শাসন- কর্তৃত্বের কেন্দ্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য যার কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামও মানুষের প্রকৃতির দাবী মিটানোর

পদক্ষেপ নিয়েছে। ভূমিকা স্বরূপ উপস্থাপিত এ দু'টি বিষয়ের উপসংহার হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া, সুপরিচালনা ও পরিস্থিতির জ্ঞানে সকলের চেয়ে অগ্রসর, তিনিই বেলায়াত বা শাসন-কর্তৃত্বের জন্য অগ্রাধিকার লাভ করবেন এবং তাকেই এ দায়িত্বে বসাতে হবে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের দায়িত্বে যিনি অধিষ্ঠিত হবেন তিনি হবেন সমাজের শ্রেষ্ঠতম ও যোগ্যতম ব্যক্তি - এ ব্যাপারে কেউই সন্দেহ পোষণ করে না।"

এ ব্যাপারে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের দশম খণ্ডের ২৭ নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হযরত ইমামের উক্তি ঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর সেই বেলায়াতই। বর্তমান যুগে ফকীহগণ লোকদের ওপরে হুজ্জাত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেরূপ আল্লাহর হুজ্জাত ছিলেন এবং সকল বিষয়ই তার দায়িত্বে অর্পিত হয়েছিলো ঠিক সেভাবেই ফকীহগণ জনগণের ওপর ইমাম (আ.)- এর হুজ্জাত; মুসলমানদের সকল বিষয়ই তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর মতামতের ভিত্তি হচ্ছে বিচারবুদ্ধিজাত ও উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের ইজমা। তার শিষ্য ও অনুসারীগণও একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখেছেন। হযরত ইমাম (রহ্ঃ) ওয়ালীয়ে ফকীহ্ (মুজতাহিদ শাসক)- এর রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারকে মা'ছূমগণের (আ.) হুকুমাতী এখতিয়ারের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন।

আল্লামা শহীদ মোতাহহারীও তার "ইসলাম ওয়া মোক্বতাযিয়াতে যামান্" (ইসলাম ও যুগের দাবী) গ্রন্থে (পৃঃ ২ ও ৯১) লিখেছেনঃ "এ এখতিয়ার সমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে ইমাম (আ.)- এর নিকট এবং ইমাম (আ.)- এর নিকট থেকে শরয়ী শাসকের নিকট স্থানান্তরিত হয়। মুজতাহিদগণ যে সব বিষয়কে হারাম বা হালাল বলে রায় দিয়েছেন - বর্তমানে যার সাথে সকলেই একমত - এরই ভিত্তিতে দিয়েছেন। মীর্যায়ে শীরাযী কোন্ শরয়ী অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে তামাক বর্জনের ফতোয়া দিলেন; তা- ও আবার সাময়িক বর্জন? তিনি এ কারণে এ ফতোয়া দেন যে, তিনি জানতেন, শরয়ী শাসক কতগুলো এখতিয়ারের অধিকারী এবং প্রয়োজনবোধে তিনি সে এখতিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তো

মূল শরীয়তে যা হারাম করা হয় নি বা অন্ততঃ যার হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল পাওয়া যায় না, এমন জিনিসকে তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে নিষদ্ধ করতে পারেন।"

আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী অমোলী অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বেলায়াতে ফকীহ্ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থে (পৃঃ ২৫১) লিখেছেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে ইসলামী সমাজের ওপরে পরিচালনা সংশ্লিষ্ট এক ধরনের শাসন- কর্তৃত্ব যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনী আহকামের বাস্তবায়ন, দ্বীনী মূল্যবোধ সমূহের বাস্তব রূপায়ন, সমাজের ব্যক্তিদের প্রতিভা ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন এবং তাদেরকে ইসলাম ও কোরআন মজীদের বাঞ্ছিত পূর্ণতায় উপনীত করে দেয়া।"

আয়াতুল্লাহ্ তাকী মেসবাহ্ ইয়াযদী তার "নেগাহী গোযারা বে নাযারিয়ে বেলায়াতে ফাক্বীহ্" (বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত) গ্রন্থের "ওয়ালীয়ে ফাক্বীহ্" (মুজতাহিদ শাসক) অধ্যায়ে (পৃঃ ৯১) বলেনঃ "মুজতাহিদ শাসক হচ্ছেন সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, জনগণ যখন মা'ছূম নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় না, সে যুগে যিনি ইসলামী আহকাম কার্যকর করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত।"

আয়াতুল্লাহ্ মেসবাহ্ ইয়াযদীর মতে মা'ছূম ইমাম (আ.) মুজতাহিদ শাসককে উক্ত অনুমতি প্রদান করেন। কারণ, তিনি মনে করেন যে, "মুলমানদের সামষ্টিক কাজকর্মের ব্যাপারে বেলায়াতে ফকীহর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তিনি মা'ছূম ইমামের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।"

আর মা'ছূম এ অনুমতি পেয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে। 'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃঃ ৯৫) হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তৈরী করেছেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের প্রেক্ষাপটে এটা কি গ্রহণযোগ্য যে, মুজতাহিদগণ এ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটিকে উপেক্ষা করবেন বা এর প্রতি মনোযোগ দেবেন না?

ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ 'উযমা সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী ২০০৬ সালের ৪ঠা জুন তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেনঃ "বেলায়াতে এলাহী (মানুষের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার) মুজতাহিদের নিকট স্থানান্তরিত হয়।"

অতএব, এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্ব এ যুগে উদ্ভাবিত কোনো নতুন আলোচ্য বিষয় নয়, বরং এটির একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক অতীত রয়েছে। এ ঐতিহাসিকতার অংশবিশেষ উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে এখানে উল্লেখ করা হলো। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইলে তা এ পুস্তকের সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়, বরং সে জন্য স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ রচনার জন্য আলাদা আয়োজন প্রয়োজন।

এখানে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো তা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওলামায়ে কেরাম, মারজা'য়ে তাকলীদগণ, মুজতাহিদগণ ও বুযুর্গানে দ্বীনের মতামত, বিশেষতঃ তাদের বেলায়াতে ফকীহ্ সংক্রান্ত মতামত সম্পর্কে কতক লোক একেবারেই বেখবর। এ কারণেই তারা মনে করেন যে, ওলামায়ে কেরাম কোনো যুগেই বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু সকল যুগেই যে শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এখানে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী ১৯৯৯ সালের ৫ই জুন বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ শিয়া মাযহাবের অকাট্য বিষয় সমূহের অন্যতম।"[৩৯] তিনি তার "উজুবাতুল্ ইস্তিফতাআত্" গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬) বলেনঃ "বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছে বেলায়াত ও ইমামতের অন্যতম দিক - যা ধর্মের অন্যতম মূলনীতি।"

এমতাবস্থায় এটা কি কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধির পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ওলামায়ে ইসলাম আলোচনা ও চর্চা করবেন না অথবা এটিকে প্রত্যাখ্যান করবেন? কতক লোক যে ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে দাবী করছেন যে, তারা বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, স্বয়ং সেই ওলামায়ে কেরামই অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বেলায়াতের মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে আদেশ জারী করেছেন। আমরা উপরোক্ত সংশয় নিরসনের ও উত্থাপিত

প্রশ্নের জবাব দানের লক্ষ্যে তাদের কয়েক জনের এতদসংক্রান্ত মতামত এখানে উদ্ধৃত করেছি। পাঠক- পাঠিকাগণ যদি এ প্রসঙ্গে শেখ আনছারী, আল্লামা তাবাতাবায়ী ও আয়াতুল্লাহ্ 'উযমা বোরুজার্দীর মতামত অধ্যয়ন করেন তাহলে আর এ ব্যাপারে কোনোই সংশয় থাকবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এ ব্যাপারে সংশয়ের বিস্তার ঘটাচ্ছেন তারা কি উক্ত মনীষীদের এসব মাতামতের কথা আদৌ শোনেন নি? উক্ত মনীষীদের অন্যান্য বক্তব্যও এরই ওপর ভিত্তিশীল। বস্তুতঃ সঠিক পথ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইতিহাস এবং কালাম শাস্ত্র ও ফিকাহর গ্রন্থ সমূহ এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের উপস্থাপিত যুক্তি- প্রমাণে পরিপূর্ণ।

অতীতে বিশেষজ্ঞ পরিষদ না থাকার কারণ কী? এর ভূমিকা কী?

বেলায়াতে ফকীহ্ যদি ইসলামের অকাট্য বিষয় সমূহের অন্যতম হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে শিয়া মাযহাবের মধ্যে ইজমা থেকে থাকে, তাহলে অতীতে মুজতাহিদ শাসককে পরিচিত করিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ পরিষদ না থাকার কারণ কী? এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরিষদের ভূমিকা কী?

জবাবঃ এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও প্রত্যয় উৎপাদক জবাব দানের জন্য একটি ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে।

মরহূম মামেক্বানী[৪০] তার 'ইলমে রিজাল বিষয়ক গ্রন্থে হিশাম বিন সালেমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এতে হিশাম বিন সালেম বলেনঃ

আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর সামনে ছিলাম; তখন শামের[৪১] এক ব্যক্তি হযরত ইমামের নিকট (আসার জন্য) অনুমতি চাইলো। হযরত ইমাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে প্রবেশ করলো এবং সালাম দিলো। হযরত ইমাম (আ.) জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার সমস্যা কী?"

শামী লোকটি বললোঃ "আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, যে কোনো প্রশ্নের উত্তরই আপনার জানা আছে। এ কারণে, আপনার সাথে বিতর্ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

হযরত ইমাম প্রশ্ন করলেনঃ "কোন্ বিষয়ে?"

শামী লোকটি বললোঃ "প্রথমে কোরআন সম্বন্ধে।"

তখন হযরত ইমাম হামরান নামক তার একজন শিষ্যকে - যিনি ছিলেন কোরআন বিশেষজ্ঞ - বললেনঃ "এর সাথে বিতর্ক করো।"

হামরান শামী লোকটির সাথে বিতর্ক শুরু করলেন এবং বিতর্কে তাকে পরাভূত করলেন। এরপর শামী লোকটি বললোঃ "আমি ফিকাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করতে চাচ্ছি।" তখন হযরত ইমাম যুররেহ নামে তার অপর একজন শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন ঃ "এর সাথে বিতর্ক করো।"

এরপর হযরত ইমাম তার আরেক শিষ্য মু'মিন ত্বাক্বকে কালাম শাস্ত্রে শামী লোকটির সাথে বিতর্ক করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর 'ইলমে তাওহীদ সম্বন্ধে হিশাম বিন সালেম এবং ইমামত সম্বন্ধে হিশাম বিন হাকাম শামী লোকটির সাথে বিতর্ক করলেন। আর শামী লোকটি সকল বিতর্কেই পরাজিত হলো।

উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা হচ্ছে, যে কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তার শরণাপন্ন হতে হবে। এ কারণে হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) প্রতিটি বিষয়েই শামী লোকটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি অন্যদের তুলনায় অধিকতর বিশেষজ্ঞ তার সাথে বিতর্ক করতে বলেন। বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার মানে এটাই।

বস্তুতঃ বেলায়াতে ফকীহ্ হচ্ছেন একজন বিশেষজ্ঞ শাসক। তেমনি বেলায়াতে ফকীহকে চিহ্নিতকরণ ও জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দেয়াও একটি বিশেষজ্ঞত্ব পর্যায়ের কাজ। জনগণ ইসলামী সমাজের নেতাকে চিনতে চাচ্ছে। এ কারণে তাদেরকে অবশ্যই সেই সব ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে যারা এ বিষয়ের জ্ঞানে অধিকতর পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ, যাতে তারা নেতা চেনার কাজে ভুলের শিকার হয়ে না পড়ে।

অতীতেও এ প্রক্রিয়াই প্রচলিত ছিলো। সাধারণ জনগণ অধিকতর 'ইলমী যোগ্যতার অধিকারী মারজা-এ তাক্বলীদকে চিনে নিতে সক্ষম ছিলো না। কারণ, তারা মারজা-এ তাক্বলীদ চেনার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলো না। তারা শুধু এতটুকুই জানতো যে, মারজা-এ তাক্বলীদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ কারণে যখন কোনো মারজা-এ তাক্বলীদ ইন্তেকাল করতেন তখন একেক গ্রাম থেকে কয়েক জন লোক তেহরানে চলে আসতো এবং তারা বিভিন্ন মসজিদে যেতো ও ঐ সব মসজিদের ইমামদের নিকট জিজ্ঞেস করতো ঃ 'সবচেয়ে বড় আলেম কে?' মসজিদের ইমামগণ তথা আলেমদের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার কারণ এই যে, তারা এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তারা মসজিদের ইমামগণ বা আলেমদের নিকট থেকে ইলমে অগ্রগণ্যতার ক্ষেত্রে যদি একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ পেতো সে ক্ষেত্রে তারা দেখতো যে, যে সব আলেম কোনো না কোনো ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় আলেম বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এ

সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে কে আমলের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও বেশী তাকওয়া- পরহেযগারীর অধিকারী; তারা সাধারণতঃ তার কথার ওপরই আস্থা স্থাপন করতো। আর সাক্ষ্যদাতা আলেমগণ যদি দ্বীনী ইলম ও তাকওয়া- পরহেযগারীর ক্ষেত্রে সবাই সমান হতেন তাহলে তারা অধিকাংশের মতের অনুসরণ করতো এবং দেখতো যে, এদের মধ্যে বেশীর ভাগ কার পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা এভাবে লব্ধ ধারণাকেই মারজা- এ তাক্বলীদ হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা ও তার অনুসরণের জন্য যথেষ্ট মনে করতো। কারণ, নির্ভরযোগ্য লোকদের অধিকাংশের মত অনুসরণের জন্য হুজ্জাত হিসেবে গণ্য।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যুগে যুগে তাদের মারজা- এ তাক্বলীদ ও ওয়ালীয়ে ফকীহ্ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সব সময়ই এ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছে। তারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে অধিকতর 'ইলমী যোগ্যতার অধিকারী মারজা- এ তাক্বলীদ বেছে নেয়ার লক্ষ্যে এভাবেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হতো - যারা 'অধিকতর ইলমী যোগ্যতার অধিকারী' লোক চেনার ক্ষেত্রে যেমন বিশেষজ্ঞ, তেমনি এটাই চাইতেন যে, সর্বাধিক ইলমী যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিই তাদের মারজা- এ তাক্বলীদ হোন।

রাষ্ট্রের পরিচালনার অর্থে যিনি বেলায়াতে ফকীহর দায়িত্ব পালন করবেন তার জন্য একদিকে যেমন কতগুলো ইলমী শর্ত অপরিহার্য, তেমনি কতগুলো 'আমলী শর্তও অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইলমী শর্তসমূহের মধ্যে ফকীহ্ হিসেবে তথা মুজতাহিদ হিসেবে তার যোগ্যতা অন্যতম, আর আমলী শর্তাবলীর মধ্যে আছে ন্যায়পরায়ণতা, চিন্তা ও আচরণে ভারসাম্য, দূরদৃষ্টি, সুপরিচালনার যোগ্যতা, সাহসিকতা ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিটিরই বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এসব বিষয়ের প্রতিটি সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের ভিত্তিতে তার সম্বন্ধে ধারণায় উপনীত হয়ে থাকেন। এ কারণেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বড় বড় আলেমগণ মারজা- এ তাক্বলীদের মধ্যে সেসব ইলমী ও আমলী বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে মতামত গঠন ও প্রকাশ করতেন।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)ও লোকদেরকে এ পন্থায় ইসলামী সমাজের নেতাকে খুঁজে নেয়ার জন্য পথনির্দেশ প্রদান করেন। ইয়াকুব বিন শু'আইব হযরত ইমামকে (আ.) জিজ্ঞেস করেনঃ "ইমাম যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হন এবং এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন জনগণের করণীয় কী?"

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম (আ.) কোরআন মজীদের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন যাতে এরশাদ হয়েছে ঃ "আর মু'মিনদের জন্য এটা ঠিক নয় যে, তারা সকলেই (যুদ্ধাভিযানে) বেরিয়ে পড়ব। সুতরাং কেন তাদের (মু'মিনদের) প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে একটি ছোট্ট দল বহির্গত হলো না যারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর সমঝের অধিকারী হবে এবং তাদের কওমের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে সতর্ক করবে যাতে তারা নাফরমানী থেকে বিরত থাকে?"[৪২]

ইমাম (আ.) এরপর বলেনঃ "তারা যতদিন জ্ঞানার্জনে নিরত থাকবে ততদিন তাদের ওজর গ্রহণীয় এবং যে জনগণ তাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবে তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত উক্ত জনগণের কাছ থেকেও ওজর গ্রহণীয় হবে।"

উক্ত রেওয়ায়েত অনুযায়ী কিছু সংখ্যক মুসলমানের দায়িত্ব গোটা মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে স্বীয় বাড়ীঘর ও জনপদ থেকে বেরিয়ে মুসলিম দেশের কেন্দ্রে গমন করবে এবং তারা ইসলামী সমাজের নেতার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণা রাখে তার ভিত্তিতে ইসলামী সমাজের পরবর্তী নেতাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে। নেতার যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ বলে তাদের জানা আছে তারা তার সাথে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের অবস্থা মিলিয়ে দেখবে। তারা ইসলামী সমাজের নেতাকে চিনতে পারার পর স্বীয় কওমের কাছে ফিরে যাবে এবং তাদের কাছে নেতাকে পরিচিত করিয়ে দেবে।

মুসলিম জনগণ সর্বাধিক ইলমী যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদকে পাবার জন্যও এই একই পন্থার অনুসরণ করতো। কিন্তু সামাজিক সমস্যাবলী ফিক্বহী সমস্যাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য একটিমাত্র মতে আসা অপরিহার্য, আর সকলকেই সে রায়ের প্রতি আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে ও তা মেনে চলতে হবে।

যেহেতু অতীতে মুসলিম জনগণ অধিকতর ইলমী যোগ্যতার অধিকারী মারজা- এ তাক্বলীদকে চেনার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতো, সেহেতু এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয় যে, বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টি কোনো অভিনব বা নতুন বিষয় নয়। আর বর্তমানে মুসলিম সমাজের জন্য উপযুক্ত সামাজিক- রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী দ্বীনী নেতা চিনে নেয়ার প্রয়োজন সমুপস্থিত। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের রাষ্ট্রীয় ও সরকারী নেতা চিনে বের করতে হবে। তাদের জন্য এ ধরনের নেতার আনুগত্য হবে অপরিহার্য কর্তব্য।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামী সমাজের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারী নেতা চিনে নেয়ার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অধিকারী এমন এক বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী থাকা অপরিহার্য যাদের সাক্ষ্য সকলের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী আল্লাহ্ তা'আলা ও মা'ছূমগণের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করতে ও জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দিতে সক্ষম হবেন।

এখানে স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মা'ছূমগণকে (আ.) নিয়োগের ন্যায় মুজতাহিদ শাসকের নিয়োগ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিয়োগ নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে এ নিয়োগ হচ্ছে বিশেষ শর্তাবলী ভিত্তিক অনির্দিষ্ট নিয়োগ। তাই যে ব্যক্তির মধ্য উক্ত শর্তাবলী সর্বাধিক মাত্রায় তথা অন্য যে কারো চাইতে বেশী মাত্রায় পাওয়া যাবে এ নিয়োগ তার বেলায়ই প্রযোজ্য হবে এবং এ পদ ও দায়িত্ব তাকেই অর্পণ করতে হবে। কারণ, শরীয়তদাতা এ ব্যাপারে শুধু কতগুলো বিশেষ মানদণ্ড প্রদান করেছেন; যিনি এসব মানদণ্ডের বিচারে উপযুক্ততার অধিকারী হবেন তিনিই নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করবেন। যেহেতু এ কাজ সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে হবে, সেহেতু যারা মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করবেন ও জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দেবেন এবং তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন, তাদের মধ্যে মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য: এতদ্ব্যতীত তাদের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে এ দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ নিতে হবে। আর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের এক জায়গায় জমায়েত হওয়া ও পারস্পরিক

চৈন্তিক বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থিতিশীলতা ও নিশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। জনগণ যখন তাদের আস্থাভাজন ন্যায়বান মহান মুজতাহিদগণকে এক জায়গায় সমবেত হতে ও মুজতাহিদ শাসক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে দেখে তখন তারা নিশ্চিন্ততা অনুভব করে।

সাধারণ জনগণ জানে যে, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই মুজতাহিদ শাসক তার দায়িত্ব লাভ করেছেন। আর এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যের মর্যাদা হচ্ছে এই যে, তারা ইমাম (আ.) যে গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে শাসক নিয়োগ করার কথা বলেছেন সে গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে জনগণের সামনে পরিচয় করিয়ে দেবেন। উদাহরণ স্বরূপ, তারা যেভাবে হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল- উযমা সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীকে ইমাম (আ.) কর্তৃক বর্ণিত গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও মা'ছূমগণের পক্ষ থেকে নিয়োজিত শাসক হিসেবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু তারা তাকে 'যোগ্যতম' হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন সেহেতু এ ক্ষেত্রে কেবল 'যোগ্য' হওয়াই কারো জন্যে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার বৈধতা তৈরী করবে না। বিশেষজ্ঞগণ যখন তাকে যোগ্যতম বলে সাক্ষ্য দেন তখন এ ব্যাপারে জনগণের করণীয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা এ মুজতাহিদ শাসকের আদেশ- নিষেধ মেনে চলার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে।

বিশেষজ্ঞদের কাজ এটাই। বিশেষজ্ঞ পরিষদ হচ্ছে এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্য দানের বিষয়টি সম্পাদিত হতে পারে এবং যাদের মনে খুঁতখুঁতে ভাব আছে তারা যাতে মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ত্রুটি সন্ধান করতে না পারে, সেই সাথে জনগণের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যাপারে তার শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, ইসলামী সমাজে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং বিশ্ব কুফরী শক্তির মোকাবিলায় মুসলমানরা সম্মান, মর্যাদা ও শক্তির অধিকারী হতে পারে, আর স্বীয় দ্বীনী দায়িত্ব যধাযথভাবে পালন করতে পারে।

এর পরিবর্তে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করা হলে খোদায়ী হুকুমাতের লক্ষ্য অর্জনের মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে না, বরং সামজে মতানৈক্য দেখা দেবে। বিশেষজ্ঞগণ তাদের মতামত অকাট্যভাবে প্রকাশের মাধ্যমে মুজতাহিদ শাসককে সমাজের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন এবং ইসলামী সমাজের এ নেতাও দৃঢ়তার সাথে স্বীয় মতামত ও সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে এ সমাজের ঐক্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেন এবং বলদর্পী ও জালেম বিশ্বগ্রাসী শক্তির মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী উম্মাহ্ গঠন করেন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য এখানেই নিহিত। বস্তুতঃ একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে সব কিছুই ঐশী। এরূপ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বও খোদায়ী মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। আর বিশেষজ্ঞগণ এ সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এতদসংক্রান্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্যতম ব্যক্তিকে ইসলামী সমাজের নেতা ও শাসক হিসেবে পরিচিত করিয়ে দেন।

অনেকের ধারণার বিপরীতে, প্রকৃত পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী সমাজের নেতা ও শাসককে আইনগত বৈধতা প্রদান করেন না, ঠিক যেভাবে আলেমগণ মুজতাহিদগণের স্বীকৃতি ও অনুসরণের মাধ্যমে তাদের অধিকতর যোগ্য আলেম বা দ্বীনী বিষয়ে সার্বিকভাবে অনুসরণীয় মারজা- এ তাক্বলীদ বানিয়ে দেন না। বরং তারা ইসলামী সমাজের নেতা ও শাসকের যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে যে জ্ঞানের অধিকারী তার ভিত্তিতে, মা'ছূম ইমামগণের (আ.) পক্ষ থেকে মনোনীত মুজতাহিদ নেতা ও শাসককে চিহ্নিত করেন ও সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে তারা জনগণের সামনে তাদের করণীয় বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন।

বিশেষজ্ঞগণের এ কাজ অত্যন্ত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি কে বিশেষজ্ঞগণ তা চিহ্নিত করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। বস্তুতঃ ইসলামী সমাজের নেতা ও শাসককে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই বৈধতা প্রদান করেন, আর বিশেষজ্ঞ পরিষদ হচ্ছে যথাযথ মানদণ্ডের সাথে মিলিয়ে তাকে খুঁজে বের করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ। আর জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতামতের অনুসরণ

করা। কারণ, কেবল তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নেতা ও শাসককে খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী। এ কারণে, বিষয়টির এ ধরনের বিশেষ গুরুত্বের কারণে সাধারণ জনগণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত করে যাতে তারা একটি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হন এবং নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের ব্যাপারে জনগণের করণীয় সুস্পষ্ট করে দেন।

অতীতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) জনগণকে এ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আহ্বান জানান। তবে বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন এ কাজটিকে সহজতর করে দিয়েছে এবং এ কারণে তা জনগণের জন্য নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করেছে। অতীতে লোকেরা মারজা- এ তাক্বলীদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট অনুসন্ধান করতো। আর বর্তমানে তার পরিবর্তে বিশেষজ্ঞগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ও মা'ছূমগণের পক্ষ থেকে মনোনীত নেতা ও শাসককে চিহ্নিত করার জন্য পরস্পর পরামর্শ ও মতামত বিনিময় করছেন এবং এভাবে তাকে চিহ্নিত করার পর তাকে জনগণের সামনে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। ফলে জনগণের পক্ষে খুব সহজেই তার সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা সম্ভব হচ্ছে। বস্তুতঃ অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা অধিকতর পরিপক্ব। নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয় কাজ।

বর্তমানে বিশেষজ্ঞ পরিষদের উপস্থিতি থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব বর্তমান কালে উদ্ভাবিত একটি তত্ত্ব। যারা এ তত্ত্বকে এ যুগের উদ্ভাবন বলে দাবী করছেন তারা বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত নন। এ কারণেই কিছু লোক বলেন যে, বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। এ দাবী এদের এ বিষয় সম্পর্কে জানা না থাকা হতে উৎসারিত।

আবার দেখা যায় যে, কতক লোক বলছে, বিশেষজ্ঞ পরিষদে সমাজের সকল শ্রেণী থেকেই প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। এ বক্তব্যের উৎসও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এ সব লোকের সঠিক ধারণার অভাব। কারণ, যে কোনো বিষয়ে কেবল তাদেরই মতামত দেয়া উচিৎ যারা সে

বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ কারণে মুজতাহিদ নেতা ও শাসক চিহ্নিতকরণ সম্বন্ধেও কেবল তাদের পক্ষেই মতামত দেয়া সম্ভব যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। অতএব, কেবল এ ধরনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই বিশেষজ্ঞ পরিষদে প্রবেশাধিকার থাকা উচিৎ। তারা যদি বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব এবং অতীতে ওয়ালীয়ে ফকীহ্ বা মারজা-এ তাক্বলীদ খুঁজে বের করার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকতো তাহলে তারা এ ধরনের কথা বলতো না। এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দাবী করে যে, বিশেষজ্ঞ পরিষদের বিষয় একটি নতুন বিষয়। এসব লোকের উচিৎ এ বিষয়ে আরো বেশী জানা ও গবেষণার চেষ্টা করা। তারা যদি অতীতে ইমাম, মারজা-এ তাক্বলীদ ও ওয়ালীয়ে ফকীহ্ চিহ্নিতকরণ ও পরিচয় করিয়ে দেয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং তা নিয়ে পর্যালোচনা করে তাহলে আর তাদের মনে এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হবে না, বা হলেও তা বহুলাংশেই হ্রাস পাবে।

ফকিহ্ শাসকের এখতিয়ার কি মা'ছূমগণের (আঃ) অনুরূপ?

মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ার সমূহ কি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত, নাকি মা'ছূমগণের (আ.) হুকুমাতের অভিন্ন এখতিয়ার?

জবাবঃ ওয়ালীয়ে ফকীহ্ বা মুজতাহিদ শাসক সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে মা'ছূমগণের (আ.) সমস্ত এখতিয়ারের অধিকারী এবং তার অনমতি ব্যতিরেকে কোনো আইনই বৈধতা ও কার্যকরিতা লাভ করে না। তেমনি তার অনুমতি ব্যতীত কেউই কোনো আইন বাস্তবায়নের অধিকার রাখে না। রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্মই তার অনুমতিক্রমে সম্পাদিত হয়।

বস্তুতঃ বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) নেতৃত্ব ও শাসন- কর্র্তত্বের ধারাবাহিকতা মাত্র। এ কারণে, তারা যে সব এখতিয়ারের অধিকারী ছিলেন তিনিও তার সব কিছুরই অধিকারী। মুজতাহিদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের কোনোরূপ সীমাবদ্ধতা নেই এবং কতক সুনির্দিষ্ট কাজ নয়, বরং জনজীবনের সকল কাজই তার নিয়ন্ত্রণাধীন; তার এখতিয়ার নিরঙ্কুশ।

আল্লাহর ওলীগণের অর্থাৎ নবী- রাসূলগণ ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) হুকুমাতের দর্শন হচ্ছে সমাজের ও গণমানুষের কল্যাণ সাধন। মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ার সমূহেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের ও গণমানুষের কল্যাণ সাধন; এ কারণে তা রাষ্ট্রীয় সংবিধানের উর্ধে।

ছাহেবে জাওয়াহের (রহঃ) তার "জাওয়াহেরুল কালাম" গ্রন্থে (২১তম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪) ফকীহর এখতিয়ার সমূহের বিরোধীদেরকে তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেনঃ "বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ফকীহর এখতিয়ারের ব্যাপারে কতক লোকের মধ্যে খুঁতখুঁতে ভাব আছে। এ থেকে মনে হচ্ছে যেন তারা আদৌ ফিকাহর স্বাদ আস্বাদন করে নি এবং ফকীহগণের কথার ধরন ও রহস্য অনুধাবন করতে পারে নি। এর চেয়েও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কতক লোক এ ব্যাপারে এতই দ্বিধা- দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে যে, তারা উপরোক্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে (দেশের সীমান্ত

প্রতিরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার হেফাযত, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কোরআন মজীদ নির্ধারিত দণ্ডবিধি ও রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি কার্যকর করণ এবং কাফের ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ) ফকীহর দায়িত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের রায় ও ফতোয়া সত্ত্বেও 'কর্তৃত্ব কামনার বৈধতাহীনতার মূলনীতি'র এবং ইবনে যোহরাহ ও ইবনে ইদরীসের মতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।"

সমকালীন ফকীহগণের মধ্যে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজার্দী ফকীহর জন্য ব্যাপক ভিত্তিক এখতিয়ারের প্রবক্তা। আল্লামা শহীদ মোতাহহারী তার 'ইসলাম ভা মোক্বতাযিয়াতে যামান' (ইসলাম ও যুগের দাবী) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এবং মুজতাহিদ শাসকের ব্যাপক-বিস্তৃত এখতিয়ারের সমর্থন করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৯১ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "এ এখতিয়ার সমূহ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) থেকে ইমামের (আ.) নিকট স্থানান্তরিত হয় এবং ইমাম (আ.) থেকে মুসলমানদের শরয়ী শাসক ও বিচারকের নিকট স্থানান্তরিত হয়। মুজতাহিদগণ যে সব বিষয়কে হারাম বা হালাল বলে ঘোষণা করেছেন - যা সকলেই গ্রহণ করে নিয়েছে, তার অনেক কিছুই তারা [রাসূল (সা.) ও ইমাম (আ.) থেকে প্রাপ্ত] উক্ত এখতিয়ারের ভিত্তিতেই করেছেন। মীর্যায়ে শীরাযী কোন্ শরয়ী অনুমতির ভিত্তিতে তামাক বর্জনের হুকুম জারী করেছিলেন? তিনি এটা এ কারণে করেছিলেন যে, তিনি জানতেন, শরয়ী শাসক কতগুলো এখতিয়ারের অধিকারী যা তিনি প্রয়োজনবোধে যথাসময়ে ব্যবহার করতে পারেন; মূলগতভাবে শরীয়ত যা হারাম করে নি বা অন্ততঃ যা হারাম হওয়ার সপক্ষে দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই, বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি তা নিষিদ্ধ করতে ও বর্জনের আদেশ দিতে পারেন।"

মরহূম নারাক্বী তার 'আওয়ায়েদুল আইয়াম গ্রন্থের ১৮৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন যে, জনগণের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালনার অধিকার ও ইসলামের হেফাযতের জন্যে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও ইমামগণ (আ.) যে সব এখতিয়ারের অধিকারী ছিলেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে ফকীহগণ হুবহু সে সব এখতিয়ারের অধিকারী, কেবল অকাট্য পঠনীয় দলীল ও ইজমার দ্বারা কোনো বিষয় এ এখতিয়ারের বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়ে থাকলে

তা ব্যতীত। অনুরূপভাবে জনগণের দ্বীন ও দুনিয়ার এবং সমাজ সংস্থার হেফাযতের জন্য যে সব কাজ সম্পাদন অপরিহার্য, তেমনি শরীয়ত যে সব কাজের সম্পাদিত হওয়া দাবী করে, কিন্তু সে কাজের দায়িত্ব বিশেষ কারো ওপর অর্পণ করে নি, সে সব কাজের সবগুলো সম্পাদনের দায়িত্বই ফকীহর ওপরে অর্পিত হয়েছে। তিনি এ সমস্ত কাজেরই দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার রাখেন এবং এ ব্যাপারে কারো বাধা দেয়ার বা বিরোধিতা করার অধিকার নেই।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) ইসলামী সমাজ ও ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ শাসকের এ শাসন- কর্তৃত্ব ও সর্বোচ্চ এখতিয়ারের কথা বলেছেন। তিনি তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৪০ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "যারা ধারণা করে যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর হুকুমাতী এখতিয়ার সমূহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.)- এর চেয়ে বেশী ছিলো অথবা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.)- এর হুকুমাতী এখতিয়ার সমূহ মুজতাহিদের চেয়ে বেশী ছিলো, তাদের এ ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত ও বাতিল।"

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ৫১৯ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় উপরোক্ত সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। হযরত ইমাম বলেনঃ "সংবিধানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বেলায়াতে ফকীহর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অংশবিশেষ মাত্র, সকল এখতিয়ার নয়।"

হযরত ইমাম (রহ্ঃ) তার 'বেলায়াতে ফকীহ্' গ্রন্থের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ "ফকীহগণ হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর দ্বিতীয় স্তরের অছি (প্রতিনিধি) এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর পক্ষ থেকে ইমামগণের (আ.) ওপর যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয় ফকীহগণ তার সবগুলোরই অধিকারী। তাই তাদের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর সকল কাজই আঞ্জাম দেয়া অপরিহার্য।

"মুজতাহিদ শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে বিচারবুদ্ধিজাত কল্যাণচিন্তার ভিত্তিতে ও সকল রাষ্ট্রে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর সমাধান ও অচলাবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বীয় রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার কাজে লাগানো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর সমাধান করা।"

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) ৬ই মে ১৯৮৭ তারিখে হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীকে লেখা এক পত্রে বলেনঃ "হুকুমাতের এখতিয়ার সমূহ যদি গৌণ ঐশী বিধান সমূহের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে খোদায়ী হুকুমাতের লক্ষ্য ও হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর ওপর অর্পিত নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তত্বের বিষয়টি একটি অর্থহীন ও সুরক্ষা বিহীন প্রপঞ্চে পর্যবসিত হয়। আমি এর পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই, তা হচ্ছে, এমতাবস্থায় কেউই কোনো কিছু মেনে নিতে বাধ্য থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোনো রাস্তা নির্মাণের জন্য কোনো বাড়ীঘর বা তার আওতাধীন জায়গার অংশবিশেষ হুকুম দখল করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন তা গৌণ আহকামের কাঠামোর আওতাভুক্ত থাকে না। বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা আদায়, রণাঙ্গনে প্রেরণ, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবেশ ও দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন প্রতিহতকরণ, যে কোনো ধরনের পণ্য প্রবেশ ও বহির্গমন প্রতিহতকরণ, দু'তিন ধরনের পণ্যের ব্যতিক্রম বাদে মজুদদারী নিষিদ্ধকরণ, শুল্ক ও কর আরোপ, অস্বাভাবিক বেশী দামে মাল বিক্রি তথা মুনাফাখোরী প্রতিহতকরণ, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া, মাদক দ্রব্যের বিস্তার রোধ, এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বহির্ভূত হলেও যে কোন ধরনের নেশাখোরী নিষিদ্ধকরণ, যে কোনো ধরনের অস্ত্র বহন নিষিদ্ধকরণ এবং এ ধরনের শত শত কাজ সরকারী দায়িত্ব ও এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত ।"

হযরত ইমাম উক্ত পত্রের ধারাবাহিকতায় আরো লিখেন ঃ "আমি নিবেদন করতে চাই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের অন্যতম শাখা হুকুমাত হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের আহকাম সমূহের অন্যতম এবং তা সমস্ত গৌণ ও শাখাগত বিধানের ওপর, এমনকি নামায, রোযা ও হজ্বের ওপর অগ্রাধিকারের অধিকারী। যে বাড়ী বা মসজিদ রাস্তার মুখে পড়েছে ইসলামী শাসক তা ভেঙ্গে ফেলতে ও এর মূল্য এর মালিককে প্রদান করতে পারেন। ইসলামী শাসক প্রয়োজনের মুহূর্তে মসজিদ বন্ধ করে দিতে পারেন এবং কোনো মসজিদ যদি ক্ষতিকারক (মসজিদে যেরার) হয় এবং তা ধ্বংস করে না ফেলে তার ক্ষতিকারকতা দূর করা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি তা ধ্বংস করে ফেলবেন। সরকার জনগণের সাথে যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা কার্যকর করা বা রাখা যদি দেশের ও ইসলামের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়

তাহলে সরকার একতরফাভাবে সে চুক্তি বাতিল করতে পারে। তেমনি ইবাদত বহির্ভূত ও ইবাদত মূলক যে কোনো কাজ অব্যাহত থাকা যদি ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী প্রমাণিত হয় তাহলে যতক্ষণ তা ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী থাকবে ততক্ষণ ইসলামী শাসক তা প্রতিহত করতে পারবেন। যদিও হজ্ব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত, তথাপি তা যদি কখনো ইসলামী হুকুমাতের স্বার্থ ও কল্যাণের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে সাময়িকভাবে তিনি তা সম্পাদন থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতে পারেন।"

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, ইসলামী সমাজের কল্যাণের জন্য যখনি প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখনি মুজতাহিদ শাসক শরীয়ত ও ইসলামী মানদণ্ডের কাঠোমোর ভিত্তিতে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। কতক লোক শরীয়তকে কেবল ইবাদত- বন্দেগী ও লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, শরীয়ত মানে ইসলামের ও ইসলামী হুকুমাতের সকল আইন।

'ছাহীফায়ে নূর' গ্রন্থের নবম খণ্ডে (পৃঃ ২৫১) হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর উক্তি ঃ "হুকুমাত যদি ওয়ালীয়ে ফকীহর অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তা হচ্ছে তাগূত।"

আমাদের এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তা হচ্ছে, আমাদের সামনে দুই ধরনের হুকুমাত রয়েছে, এর বাইরে তৃতীয় ধরনের কোনো হুকুমাত নেই। এর মধ্যে এক ধরনের হুকুমাত হচ্ছে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হুকুমাত এবং অপরটি হচ্ছে তাগূতী হুকুমাত। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হুকুমাত হচ্ছে সেই হুকুমাত, যার শীর্ষে রয়েছেন মুজতাহিদ শাসক। আর তার অবস্থান হচ্ছে সকল হুকুমাতী কাজকর্ম ও বিষয়াদির উর্ধে এবং সকল কাজই তার অঅনুমতির ভিত্তিতে বৈধতা লাভ করে। এর অন্যথা হলে তা হবে বাতিল ও তাগূতী হুকুমাত।

বস্তুতঃ দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন ও তাগূতী হুকুমাতের সমর্থক লোকেরা মুজতাহিদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে সন্দেহ- সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা তাদের নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই একই ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করে থাকে, কিন্তু ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সে হুকুমাত একই ক্ষমতা ও এখতিয়ার ব্যবহার করলে তারা এই বলে হৈচৈ করে যে, ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সম্প্রসারণ স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি করে।

আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন ও রাশিয়ায় সরকার প্রধানকে অনেক বেশী ক্ষমতা ও এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সকল প্রকার নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়াও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে কংগ্রেসে গৃহীত বিলে ভেটো প্রদান করতে পারেন এবং জরুরী প্রয়োজনে এমন সব অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন যা কার্যকর করতে কংগ্রেস, রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় সমূহ বাধ্য।

ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন। প্রেসিডেন্টই মন্ত্রীদের নিয়োগদান করেন এবং তিনি রাষ্ট্রের অপর দুই বিভাগ অর্থাৎ আইন সভা ও বিচার বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

বৃটেনে সাংবিধানিকভাবে রাজা বা রাণী মন্ত্রীদের, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও বরখাস্তের এখতিয়ারের অধিকারী। যদিও ঐতিহ্যিকভাবে তিনি সংখ্যাগুরু দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগদান করেন, কিন্তু তিনি এর অন্যথা করলেও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বৈধ। এছাড়া সেখানে রাজা বা রাণীর পদটি উত্তরাধিকার ভিত্তিক ও আজীবন পদ। তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন এবং সংবিধানে তার অপসারণের কোনো বিধান নেই।

জার্মানীর প্রেসিডেন্ট দেশের চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী)কে বরখাস্ত করতে পারেন এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন।

রাশিয়ায়ও প্রেসিডেন্ট চাইলে ডুমা (পার্লামেন্ট)কে ভেঙ্গে দিতে পারেন।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই বাদশাহ, সম্রাট, রাজা বা প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ সুযোগ- সুবিধা এবং ক্ষমতা ও এখতিয়ার রাখা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, এ পদটি দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উর্ধস্থ পদ এবং তিনি আইনের উৎসও বটে। অতএব, তাদের জন্য আইনের অধীন হওয়া জরুরী গণ্য করা হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ, ডেনমার্ক ও স্পেনের সংবিধানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। বেলজিয়ামের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সম্রাটের কাজে কোনো

ভুল থাকতে পারে না। ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রেসিডেন্টকে কেবল তখনি জবাবদিহি করতে হবে যদি তিনি জনগণের সাথে বড় ধরনের বিশ্বসঘাতকতা করে থাকেন।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুজতাহিদ ফকীহর এখতিয়ার সমূহ শরয়ী মানদণ্ড ও ইসলামী মূলনীতির কাঠামোর আওতাধীন।

ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী ২০০৭ সালের ৪ঠা জুন তারিখে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর মাযারে আগত যিয়ারতকারীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সম্পাদনীয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলার যে শাসন- কর্তৃত্ব মুজতাহিদ শাসকের কাছে স্থানান্তরিত হয় তা খোদায়ী আহকামের অনুসরণের শর্তাধীন।"

হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী একই তারিখে প্রদত্ত অপর এক ভাষণে বলেনঃ "যে ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি যদি চৈন্তিক ও আচরণগত দিক থেকে ইসলামী আশা- আকাঙ্ক্ষা ও ইসলামী আইন- কানুনের অনুবর্তী না হন তাহলে তিনি বৈধতা থেকে পতিত হন এবং কারো জন্য যে তার আনুগত্য ফরয নয় শুধু তা- ই নয়, বরং জায়েয নয়।"

ইসলাম এমন একজন ব্যক্তিকে হুকুমাতী দায়িত্ব প্রদান করে যিনি মুজতাহিদ, চিন্তা ও কর্মে ভারসাম্যের অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনী 'ইলমের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য এবং দ্বীনী আহকাম অনুসরণ করে চলেন। অন্যদিকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রবক্তা দেশ সমূহের সরকারগুলো মানবতার ওপর যুলুম- নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিরাট এখতিয়ারের অধিকারী, অথচ এদেরই অনেকে মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ার সমূহ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অথচ এ এখতিয়ার সমূহ জনগণের আস্থাভাজন ঐ সব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মুজতাহিদ শাসককে প্রদান করেছেন, মুসলিম জনগণের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও অনুসৃত অকাট্য ইসলামী সূত্রের উক্তি অনুযায়ী যারা নিজেরা নবী- রাসূলগণের (আ.) উত্তরাধিকারী ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জনগণের ওপর মনোনীত নেতা ও শাসক। আমরাও উক্ত বিশেষজ্ঞগণের অনুসরণে মুজতাহিদ শাসকের আনুগত্য ও অনুসরণ

করছি। আর ওলামায়ে দ্বীন মা'ছূমগণের (আ.) মতের ভিত্তিতেই মুজতাহিদ শাসকের জন্য এসব এখতিয়ার চিহ্নিত করেছেন।

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)ও এরই ভিত্তিতে বলেনঃ "সংবিধানে যা বর্ণিত হয়েছে তা মুজতাহিদ শাসকের ক্ষমতা ও এখতিয়ার সমূহের অংশবিশেষ মাত্র, সব নয়।"

হযরত ইমামের এ কথা বলার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ার সমূহ হচ্ছে হুবহু মা'ছূমগণের (আ.) রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার সমূহ। আর দ্বীন ও তার মূল্যবোধ সমূহের হেফাযতের লক্ষ্যে এ এখতিয়ার সমূহ ব্যবহার করা তার শুধু অধিকারই নয়, বরং কর্তব্যও বটে।

মুজতাহিদ শাসক দ্বীন ও শরীয়তের মানদণ্ডে কোনোরূপ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবেন না তথা অন্যায় বা অপরাধের আশ্রয় নেবেন না, অন্য কথায় তিনি স্বেচ্ছাচারী হবেন না যে, আমরা তার ক্ষমতা ও এখতিয়ার সমূহের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবো। আর তার দিক থেকে সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ না করা তথা অন্যায় বা অপরাধের আশ্রয় না নেয়া এবং স্বেচ্ছাচারী না হওয়ার রক্ষাকবচ এই যে, তিনি সীমালঙ্ঘন করলে বা স্বেচ্ছাচারী হলে নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলবেন; অতঃপর আর তিনি আনুগত্য লাভের অধিকারী থাকবেন না, বরং কারো জন্যই তার আনুগত্য অব্যাহত রাখা জায়েয হবে না।

বস্তুতঃ কোনো ব্যক্তি যখন শরয়ী ও ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী কাজ করেন ও দায়িত্ব পালন করেন তখন তার পক্ষে স্বৈরাচারী বা তাগূতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী না হন তাহলে তার পক্ষে জনগণের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান করা সম্ভব হয় না। বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী আমরা যদি মেনে নেই যে, শাসককে এ ধরনের সমস্যাবলী ও জটিলতার সমাধানকারী হতে হবে তাহলে মানতে হবে যে, অবশ্যই তাকে পরিপূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী হতে হবে। অন্যদিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা স্বীকার করি যে, মুজতাহিদের হুকুমাত হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূমগণের (আ.) হুকুমাতের ধারাবাহিকতা মাত্র, তাহলে এটা সম্ভব নয় যে, তাদের কারো জন্যে ব্যাপক ভিত্তিক হুকুমাতী এখতিয়ারের প্রবক্তা হবো এবং কারো জন্য সীমিত এখতিয়ারের

প্রবক্তা হবো। অতএব, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, মুজতাহিদের হুকুমাত হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূম ইমামগণের (আ.) হুকুমাতের ধারাবাহিকতা বিধায় হুবহু হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মা'ছূমগণের (আ.) হুকুমাতের এখতিয়ারের অধিকারী।

মুজতাহিদ শাসক হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে দ্বীনের অভিভাবক। অতএব, তার দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিক ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে ইসলামের সকল দিকের ও সকল আহকামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। ইসলামী শাসক যাতে ইসলামের সকল আহকামের বাস্তবায়ন করতে পারেন সে লক্ষ্যে অবশ্যই তাকে হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর ইসলামী আহকাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি যদি দেখতে পান যে, কোনো ক্ষেত্রে দু'টি হুকুমের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য হুকুমটি বাস্তবায়ন করবেন। পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসকের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ইসলামের দণ্ডবিধি, অর্থনৈতিক আইন ও অন্যান্য বিধি- বিধান বাস্তবায়ন এবং সমাজে বিকৃতি, অনৈতিকতা ও পাপাচারের বিস্তার রোধ। এ সবের বাস্তবায়নের জন্য সকল জনগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সমন্বিত পরিচালনা ব্যবস্থা বা প্রশাসন এবং সুবিচারের লক্ষ্যাভিসারী ও শক্তিশালী একটি হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

ইসলামের সকল ধরনের আহকামের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী শাসকের জন্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা এবং দেশের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে ইসলামের স্থায়ী আইন- কানুনের আওতায় ও শর্তাধীনে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম- রীতি ও বিধি- বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন অপরিহার্য। তিনি সশস্ত্র বাহিনী সমূহের অধিনায়কদের নিয়োগদান করবেন এবং জনগণের জান, মাল ও ইজ্জত- সম্ভ্রম এবং দ্বীনী সমাজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাযতের লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ও প্রয়োজন বোধে শান্তি বা সন্ধির সিদ্ধান্ত নেবেন। দেশের অভ্যন্তরস্থ গোষ্ঠী সমূহের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ, বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বিদেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ, দেশের সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়োজিত করণ, জুম'আ ও পাঞ্জেগানা জামা'আত সমূহের জন্য ইমাম নিয়োগ, যাকাত ও কর আদায়ের জন্য দায়িত্বশীল

নিয়োগ, অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও কর্ম সম্পাদনের জন্য বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্বশীল নিয়োগ এবং শত শত প্রশাসনিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক, আইন বিষয়ক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নিয়ম- কানুন ও বিধি- বিধান প্রণয়ন ইত্যাদি অসংখ্য কাজ মুজতাহিদ শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত। এসব দায়িত্ব- কর্তব্য আঞ্জাম দেয়া ছাড়া এবং এজন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ার ব্যতীত ইসলামের সকল দিকের আদেশ- নিষেধের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বাঞ্ছিতভাবে ইসলামী সমাজের পরিচালনা সম্ভব নয়।

এসব এখতিয়ার ইসলামী হুকুমাতের মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে মুজতাহিদ শাসকের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে। এসব এখতিয়ার প্রাথমিকভাবে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর হুকুমাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো এবং পরে তার নিকট থেকে তা মা'ছূম ইমামের (আ.) হুকুমাতে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর তা ইমামের (আ.) নিকট থেকে প্রতিটি শরয়ী হুকুমাতে স্থানান্তরিত হয়।

বস্তুতঃ একটি রাষ্ট্রের এখতিয়ার অত্যন্ত ব্যাপক। অতীতে ছিলো না এমন নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে ইসলামী হুকুমাতের সামনে নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। নবোদ্ভূত এসব পরিস্থিতির দাবী মিটাবার জন্য ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক বিধিবিধানের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রকে নতুন নতুন আইন- কানুন ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করতে হবে। আসমানী বিধি- বিধানের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নব নব পরিস্থিতির দাবী মিটাবার জন্য নতুন নতুন আইন- কানুন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন এবং প্রতিটি যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী শাসককে অবশ্যই ব্যাপক ভিত্তিক এখতিয়ারের অধিকারী হতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে, সুবিচার ও বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী দ্বীনী শাসকের ক্ষমতা ও এখতিয়ার এমনভাবে শর্তাধীন হওয়া উচিৎ নয় যার ফলে দ্বীনী হুকুমাত সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং সামাজিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

মুজতাহিদ নন এমন বিশেষজ্ঞগণ কি বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য হতে পারেন?

জবাবঃ ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর পরই হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর উপস্থিতিতে যখন সংবিধান প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সামনে বেলায়াতে ফকীহ্ মূলনীতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো তখনো অন্য একভাবে এ সংশয় উত্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যদের জ্ঞান, সচেতনতা ও দূরদর্শিতা এবং ইসলামী বিপ্লবোত্তর ভাবগম্ভীর পরিবেশের কারণে এ প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে নি ও সহজেই বাদ পড়ে যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে, ভবিষ্যত রাহবার হিসেবে মনোনীত ব্যক্তিকে[৪৩] বাদ দেয়ার পরে এবং বিশেষ করে সংশোধনের যুগে এ সংশয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বর্তমানে অধিকতর শক্তিশালীভাবে তা উপস্থাপিত হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত থাকার যুগে মুজতাহিদ শাসক হচ্ছেন ইমামতের পদের স্থলাভিষিক্ত এবং তিনি আল্লাহর ওলীগণের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তার হুকুমাতের বৈধতা মা'ছূম ইমামের (আ.) হুকুমাতের বৈধতার ন্যায়ই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকেই উৎসারিত। বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউই মুজতাহিদের হুকুমাতের বৈধতা প্রদানের উপযুক্ত নয়।

এ বিষয়টির মূল নবুওয়াতের দর্শনে নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে, মানুষের জন্য আদর্শ নির্ধারণ ও আইন মূলগতভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে সব আইন প্রয়োগের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাসক নির্ধারণ বা মনোয়ন অপরিহার্য। আর মুজতাহিদ শাসক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার নৈকট্য, চিন্তা ও আচরণের ভারসাম্য, সুবিচার ও ইলমী অগ্রগণ্যতার কারণে এ দায়িত্বের জন্য মনোনীত হন।

ইসলামে হুকুমাতের মর্যাদা হচ্ছে একটি খোদায়ী কার্যের হেফাযতের মর্যাদা। এর মানে হচ্ছে, আসমানী দ্বীন এবং ঐশী ও পবিত্র পদ এর মালিক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হতে হবে।

মা'ছূম ইমামমগণের (আ.) প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের যুগ শেষ হওয়ার পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মগোপনরত থাকার যুগ শুরু হয় এবং তিনি কখন আত্মপ্রকাশ করবেন তা কারোই জানা নেই। এমতাবস্থায় জনগণকে তো তাদের সামাজিক ও সামষ্টিক প্রয়োজনের প্রশ্নে পথনির্দেশনা ও পরিচালনা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যায় না। (এরূপ ছেড়ে দেয়া হলে তা হতো বিচারবুদ্ধির দাবীরও পরিপন্থী।) তাই মা'ছূম ইমাম (আ.) তার পক্ষ থেকে সাধারণ ও নীতিগতভাবে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শাসকের শর্ত ও গুণাবলী জানিয়ে দেন এবং এভাবেই মুসলিম সমাজের জন্য মুজতাহিদ শাসক মনোনীত করেন। আর বিশেষজ্ঞগণের দায়িত্ব হচ্ছে ইমাম (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করা ও জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দেয়া। এর ফলে তার শাসন- কর্তৃত্ব সমাজের জন্য অলঙ্ঘনীয় হয়ে যায়।

অতএব, বিষয়বস্তুর দাবী অনুযায়ী, এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদকে চিহ্নিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী হতে হবে। তাই বিশেষজ্ঞের জন্য বিশেষজ্ঞত্বের যে ন্যূনতম শর্ত রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, তাকে অন্ততঃ ফিকাহর কতক বিভাগে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে যাতে তার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞত্বের সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ১০৭ নং ধারা অনুযায়ী মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের আহকাম ও ফিক্বহী বিষয়াদির জ্ঞানে বা রাজনৈতিক ও সামাজিক- সামষ্টিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতা বা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বা সংবিধানের ১০৯ নং ধারায় বর্ণিত গুণাবলীর কোনোটির ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু যারা মুজতাহিদ নন তারা কিছুতেই ইসলামের আহকাম ও ফিক্বহী বিষয়াদির জ্ঞানে কোন্ মুজতাহিদ অগ্রগণ্য তা নির্ণয় করতে সক্ষম নন। অন্যদিকে এ ইজতিহাদী যোগ্যতা ব্যতীত অন্য

যে সব যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে একজন মুজতাহিদের মধ্যে তা আছে কিনা মুজতাহিদগণের পক্ষে তা- ও নির্ণয় করা সম্ভব।

ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের মর্যাদা অত্যন্ত সমুন্নত ও পবিত্র মর্যাদা। এ কারণে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শাসকের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ গুণাবলী ছাড়াও দ্বীনী বিষয়ে বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য যাতে তিনি যথাযথভাবে দ্বীন ইসলামের হেফাযত করতে পারেন। তাই বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই এ ধরনের যোগ্যতম ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তারা মুজতাহিদ শাসক মনোনয়ন ও তাকে এখতিয়ার প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মুজতাহিদ শাসকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ সর্বাধিক মাত্রায় কার বেলায় প্রযোজ্য হয় তা চিহ্নিত করার মতো যোগ্যতা তাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

বর্তমানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম নয় যারা ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়াও অর্থনীতি, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রশাসনিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীরও অধিকারী। তবে মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিতকরণ ও বিশেষজ্ঞ পরিষদে স্থানলাভের জন্য মূল ও অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে তাকে মুজতাহিদ হতে হবে এবং যোগ্যতম মুজতাহিদ কে সে সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণার অধিকারী হতে হবে। আমরা যদি ধরে নেই যে, পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করার জন্যে অন্যান্য জ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরও দরকার আছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে এমন মুজতাহিদকে বিশেষজ্ঞত্বের দায়িত্ব দেয়া উচিৎ যিনি অন্যান্য জ্ঞানেও বিশেষজ্ঞ, কিন্তু কিছুতেই বিশেষজ্ঞের জন্য মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত বাদ দেয়া তথা মৌলিক বিষয়কে বাদ দিয়ে গৌণ বিষয়কে যথেষ্ট গণ্য করা যেতে পারে না। এর বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামী নেতৃত্ব তথা মুজতাহিদ শাসকের জন্য মূল শর্ত হচ্ছে তাকে ফিকাহর ক্ষেত্রে রায় দেয়ার মতো যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে তার যোগ্যতা অবশ্যই কাম্য, তবে ফিকাহ্ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে তার বিশেষজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য নয়। এখানে ফিকাহ্ই গুরুত্বপূর্ণ, এ কারণে বিশেষজ্ঞদেরকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

একটি বিমানের ডিজাইন করার কাজ সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করেন এমন একজন আরেফ ও দার্শনিক মুজতাহিদকে দেয়া যেতে পারে না, এমনকি একই সাথে তিনি যদি একজন স্থাপত্য বিশারদও হয়ে থাকেন। বিমানের ডিজাইন তৈরীর জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী আলাদা ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন। অন্যদিকে একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদের কাজে দক্ষতার অধিকারী। আর বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যদের যে কাজ তা মুজতাহিদগণের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ, এ পরিষদের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত ও সমাজের নিকট পরিচিত করিয়ে দেয়া। তাকে চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ফিকাহর জ্ঞান। অতএব, তাকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, রাজনীতি ও প্রশাসন পরিচালনা বিশেষজ্ঞত্বের বিষয়। তাদের মতে, প্রশাসন পরিচালনা ও রাজনৈতিক যোগ্যতাই মুখ্য বিষয়, একাডেমিক ডিগ্রী মুখ্য বিষয় নয়। মুজতাহিদ শাসকের এ প্রশাসনিক যোগ্যতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা চিহ্নিত করার জন্য আলাদা কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নেই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করণ ও সে লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠনের বিধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অতএব, যারা নিজেদেরকে আইনের সমর্থক বলে দাবী করেন তারাও এ বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ১৩৫৯ ফার্সী সালের মেহের মাসে (অক্টোবর ১৯৮০) প্রণীত বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের ২নং ধারা অনুযায়ী জনগণের নির্বাচিতব্য বিশেষজ্ঞদেরকে নিুলিখিত শর্তের অধিকারী হতে হবে ঃ

১) দ্বীনদারী, সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং চারিত্রিক উপযুক্ততা,

২) এমন পর্যায়ের ইজদিহাদী যোগ্যতা যাতে কতক ফিকহী সমস্যার সমাধান প্রমাণ করতে সক্ষম হন,

৩) রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি এবং চলমান রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সাথে পরিচিতি,

৪) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আস্থাশীল,

৫) দূষণীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অতীতের অধিকারী না হওয়া।

অতএব, মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত করার বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যপদের জন্য যারা প্রার্থী হবেন তাদেরকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে - যারা ফিকাহর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্ততঃ কতগুলোতে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ফিক্বহী বিধান অনুসন্ধানের যোগ্যতার অধিকারী। সেই সাথে তাদেরকে চারিত্রিক দিক থেকে উপযুক্ত হতে হবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টিরও অধিকারী হতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলে অতঃপর আর উপরোক্ত সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

অতএব, ইজতিহাদী ভিত্তি, অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক জ্ঞানের আলোকে বিশেষজ্ঞ পরিষদে অ-মুজতাহিদ বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির দাবীর পিছনে শরয়ী ও আইনগত কোনো প্রমাণ নেই।

অন্ত্যটীকা :

১. এর মানে এ নয় যে, প্রতিটি আইনেই তার স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কাজের জন্যই স্বতন্ত্রভাবে তার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। বাস্তবতার দৃষ্টিতেও একজন মানুষের পক্ষে এত কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এই যে, নীতিগতভাবে সকল রাষ্ট্রীয় কাজ তার পক্ষ থেকেই সম্পাদন করা হবে এবং তিনি সব কিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। প্রত্যেকেই তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কারো কোনো কাজে আপত্তি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজে তার অনুমোদন বা অনুমতি আছে বলে গণ্য হবে। তিনি যদি কখনো কারো কোনো কাজে দ্বিমত করেন বা হস্তক্ষেপ করেন সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তার মতই কার্যকর হবে। এটাই হচ্ছে এ তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক। - অনুবাদক

২. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে এ ধারণার প্রায়োগিক দিক একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। তা হচ্ছে, নির্বাচিতব্য পদগুলোতে কারো নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড রাখা হয়েছে যার আলোকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে কাউকে প্রার্থী হবার অনুমতি দেয়া হয়। (বলা বাহুল্য যে, সব দেশেই এ ব্যাপারে কতক মানদণ্ড রয়েছে, যেমন ঃ ফৌজদারী অপরাধে শাস্তি প্রাপ্তদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রার্থী হতে না দেয়া।) এর মানে হচ্ছে, যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের সকলেই ঐ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত, অতএব, তাদের মধ্য থেকে যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন তার নির্বাচনে ও দায়িত্ব গ্রহণে মুজতাহিদ শাসকের অনুমোদন রয়েছে বলে গণ্য হবে। - অনুবাদক

৩. প্রাথমিক পর্যায়ের বা প্রথম স্তরের হুকুম সমূহ (احكام اولية) একটি ফিক্বহী পরিভাষা। এর মানে হচ্ছে ইসলামের মৌলিকতম বিধান যার অবস্থান শাখা- প্রশাখাগত হুকুম সমূহের উর্ধে এবং এ কারণে কোনো শাখাগত হুকুমের সাথে তার সাংঘর্ষিকতা দেখা দিলে মৌলিক বিধানই কার্যকর হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তির জীবন সম্মানীত এবং ব্যক্তির সম্পদের ওপর তার অধিকার নিরঙ্কুশ। কিন্তু ইসলামী হুকুমাতের হেফাযত ও কল্যাণ তার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অপরিহার্য বিবেচিত হলে ইসলামী শাসক তাকে যুদ্ধে পাঠাতে পারবে যা তার জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে এবং তার বৈধ সম্পদ হুকুম দখল, বাযেয়াফত বা জাতীয়করণ করতে পারবে। অন্যদিকে ইসলামী হুকুমাত প্রয়োজন বোধে ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানের কার্যকরীকরণ

সাময়িকভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখে বা সীমাবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় বিধান জারী করতে পারে যা কেবল ঐ বিশেষ সময়ে বা ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির অবসান ঘটলে বা আইনটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে উক্ত রাষ্ট্রীয় আইনটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূল বিধানটি কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্রীয় আইনটি দ্বিতীয় স্তরের হুকুম (حكم ثانوية) বলে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ, শরীয়তের মূল বিধান অনুযায়ী যে সব নর- নারীর মধ্যে বিবাহ বৈধ প্রয়োজনে ইসলামী হুকুমত তাদের বিবাহে বাধা দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী রাষ্ট্র শত্রুভাবাপন্ন দেশের নাগরিকের সাথে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এবং যুদ্ধকালে সাময়িকভাবে যে কোনো ভিনদেশী নাগরিকের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকের বিবাহ নিষিদ্ধ করতে পারে। - অনুবাদক

৪. শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের আক্বিদাহ্ অনুযায়ী, বিশ্ব যুলুম- অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায়- অনাচারে পূর্ণ হয়ে যাবার পর মানবতাকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর বংশে একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব হবে; তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নামে সুপরিচিত হবেন। তিনি যুলুম- অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায়- অনাচারের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তখন বিশ্ব সুবিচার ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। শিয়া মাযহাবের আক্বিদাহ্ অনুযায়ী, আহলে বাইতের ধারাবাহিকতায় আগত দ্বাদশ ইমামই (জন্ম হিজরী ২৫৫ সাল) হচ্ছেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.); আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খিজির (আ.)- এর ন্যায় তাকে দীর্ঘজীবী করেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি আত্মগোপনরত অবস্থায় আছেন। তিনি স্বীয় পরিচয় গোপন রেখে জনসমাজে বিচরণ করছেন, তবে স্বীয় মতামত দিয়ে সমাজকে, বিশেষ করে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাবিত করছেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন, এরপর ইসলামী বিশ্ববিপ্লবে নেতৃত্ব দেবেন। তার এখন থেকে হাজার বছরেরও বেশী কাল পূর্বে জন্মগ্রহণ ও দীর্ঘজীবী হওয়ার ধারণা অবশ্য আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরামের নিকট গৃহীত হয় নি। তাদের ধারণা, তিনি এখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। অবশ্য আহলে সুন্নাতের তথ্যসূত্র সমূহেও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মপ্রকাশ, মুসলমানদের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং ইসলামী বিশ্ববিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদানের কথা আছে; তার আত্মপ্রকাশপূর্ব জীবন সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। এ থেকে আত্মপ্রকাশের পূর্বে তার জনসমাজে অপরিচিত থাকার ধারণাই প্রমাণিত হয়, তা তার সে জীবন

পঞ্চাশ, একশ' বা হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশী - যা- ই হোক না কেন। তবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন কি করেন নি - সে বিতর্কের ফয়সালার ওপর বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসনের অপরিহাযতা নির্ভরশীল নয়। কারণ, উভয় অবস্থায়ই ইমাম (আ.)- এর আত্মপ্রকাশের পূর্বে মুসলমানরা মুজতাহিদের শাসনের মুখাপেক্ষী। - অনুবাদক

৫. জনগণ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার শর্ত সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয় যে, নবী- রাসূলগণ (আ.) এবং সেই সাথে শিয়া মাযহাবের আক্বিদাহ্ অনুযায়ী বারো জন নিষ্পাপ ইমাম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের পথপ্রদর্শন ও নেতৃত্বের জন্য মনোনীত। আর যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত পথপ্রদর্শক ও নেতা হিসেবে জানে তার পক্ষে ঐ ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে গণ্য না করে অন্য কাউকে শাসক হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। অতএব, সে সর্বাবস্থায়ই খোদায়ী নেতৃত্বের নিকট আত্মসমর্পিত থাকবে। তবে বাস্তবে গোটা সমাজের ওপর খোদায়ী নেতৃত্বের শাসন- কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি খোদায়ী বিধানে ব্যাপক জনগোষ্ঠী কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে নেতা ও শাসক রূপে গ্রহণের শর্তাধীন রাখা হয়েছে। কারণ, পরম জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা জোর- জবরদস্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে খোদায়ী শাসন প্রতিষ্ঠাকে উচিৎ গণ্য করেন নি। এ কারণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নবী- রাসূলই (আ.) রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ পান নি। তবে রাষ্ট্র ও প্রশাসন খোদায়ী নেতৃত্বের হাতে থাকা ও না থাকা - এ দুই অবস্থায় তার সাথে মু'মিনের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পার্থক্য হতে পারে না। উভয় অবস্থায়ই খোদায়ী নেতৃত্বই মু'মিনের শাসক; রাষ্ট্র ও প্রশাসনে তার নিয়ন্ত্রণ না থাকা অবস্থায় সে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে মু'মিনের সম্পর্ক ও আচরণ খোদায়ী নেতৃত্বের নির্দেশ ও অনুমতি দ্বারা নির্ধারিত হবে। এ ব্যাপারে নবী- রাসূল (আ.), মা'ছূম ইমাম (আ.) ও নায়েবে নবী বা মুজতাহিদের সাথে মু'মিনের সম্পর্কে কোনোই পার্থক্য হতে পারে না। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন কারো প্রকৃত নায়েবে নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি হয় তখন তার আদেশ ও অনুমতিকে নবী- রাসূল (আ.)- এর আদেশ ও অনুমতির তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করার কোনোই অবকাশ থাকে না। - অনুবাদক

৬. ফকিহ শাসক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার কথাটি অত্র গ্রন্থে এর পর আরো বহু বার উল্লিখিত হয়েছে। কারো কাছে হয়তো এটিকে ভাবাবেগমূলক ও ভাবাবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা বলে মনে হতে পারে। কারণ, নবী- রাসূলগণ (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত এবং

তা তাদেরকে অবগত করা হয়, অতঃপর তারা নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করে সমাজে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে, শিয়া মাযহাবের আক্বিদাহ্ অনুযায়ী, মা'ছূম ইমামগণও (আ.) ইমাম হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ও হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)- এর মাধ্যমে ঘোষিত এবং তারা নিজেরাও তা জানতেন ও নিজেদেরকে ইমাম বলে দাবী করতেন। কিন্তু কোনো ফকিহ শাসকের নাম সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত শাসক হিসেবে দ্বীনের কোনো সূত্রে (কোরআন- হাদীছে) উল্লিখিত নেই এবং তিনি নিজেও তা জানেন না বলে নিজেকে খোদায়ী শাসক হিসেবে দাবী করেন না, বরং বিশেষজ্ঞগণ তাকে চিহ্নিত ও পরিচয় করিয়ে দেন। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাসক হিসেবে মনোনীত - এরূপ অকাট্য ধারণা পোষণের ভিত্তি কী?

এর ভিত্তি দু'টি বিষয়। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোনো যুগে তার বান্দাহেদরকে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দানকারী তার মনোনীত নেতা ও শাসক থেকে বঞ্চিত রাখবেন - বিচারবুদ্ধি এটা মানতে পারে না। শিয়া মাযহাবের আক্বিদাহ্ অনুযায়ীও, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সমাজে বিচরণ করলেও তিনি যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে ও স্বীয় পরিচয় সহকারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না সেহেতু প্রত্যক্ষ খোদায়ী নেতৃত্বের উক্ত প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আহলে সুন্নাতের মধ্যেও প্রত্যেক যুগ বা শতাব্দীতে মুজাদ্দিদের অস্তিত্ব থাকার বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। যদিও সে বিশ্বাস পুরোপুরি আক্বায়েদী ভিত্তি লাভ করে নি, তবে এ ধরনের বিশ্বাসের উদ্ভব খোদায়ী পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ ফকিহ নেতা কর্তৃক নিজেকে নেতা ও শাসক হিসেবে দাবী না করা এবং অন্য মুজতাহিদগণ কর্তৃক তাকে নিজেদের মধ্যে এ দায়িত্বের জন্যে যোগ্যতম রূপে চিহ্নিত করা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত শাসক। কারণ, তার পক্ষ থেকে প্রার্থিতা ও দাবী না থাকা এবং বিশেষজ্ঞগণ তথা মুজতাহিদগণ কর্তৃক ইখলাছের সাথে খোদায়ী নেতৃত্বকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে তাকে চিহ্নিত করা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনিই এ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তি। আর উপযুক্ততম ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত শাসক নন, অন্য কেউ হবেন এবং বিশেষজ্ঞগণ ইখলাছের সাথে অনুসন্ধান করেও তাকে চিহ্নিত করতে পারবেন না এটা অসম্ভব ব্যাপার। শুধু তা- ই নয়, মানুষ যখন নিঃস্বার্থভাবে ও ইখলাছের সাথে চেষ্টা করেও পথ খুঁজে না পায় তখন সে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও

পথনির্দেশ কামনা করে এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে সঠিক পথের সন্ধান জাগ্রত করে দেন। অতএব, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, এভাবে খুঁজে বের করা শাসক যে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় শাসক তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। - অনুবাদক

৭. জনগণের দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ নির্বাচিত হন এবং তারা মুজতাহিদ শাসককে চিহ্নিত ও জনসমক্ষে পরিচিত করিয়ে দেন - এ কারণে অনেকে এ কাজটিকে পরোক্ষ নির্বাচন বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের সাথে এ কাজের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ ইলেক্টোরাল কলেজের ন্যায় কোনো সুনির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে জনগণের রায় নিয়ে আসেন না । বরং এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ বিশেষজ্ঞদের ওপর তাদের আস্থার কথা ঘোষণা করে, কিন্তু তাদের পক্ষে আদৌ ধারণা করা সম্ভব নয় যে, বিশেষজ্ঞগণ কাকে শাসক হিসেবে চিহ্নিত করবেন। কারণ, খোদায়ী শাসকের সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং এ বৈশিষ্ট্যের বিচারে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে সে সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অকাট্য ধারণা থাকে না; থাকলে তারাই খোদায়ী শাসককে চিহ্নিত করতে পারতো, বিশেষজ্ঞদের ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিতে হতো না। এ কারণেই এমনও হতে পারে যে, খোদায়ী শাসকের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'জন মুজতাহিদের মধ্যে যিনি বেশী জনপ্রিয় তথা জনগণের ভোটে নির্বাচিত করলে যিনি নির্বাচিত হতেন বিশেষজ্ঞগণ তাকে নির্বাচিত না করে বিশেষজ্ঞত্বের দৃষ্টিতে অপর জনকে যোগ্যতম লক্ষ্য করে তঁকেই শাসক হিসেবে চিহ্নিত ও জনগণের সামনে পরিচিত করিয়ে দেবেন। - অনুবাদক

৮. মেহদী বাযারগানকে। - অনুবাদক

৯. নারাক্বী নামে বেশ কয়েক জন ইসলামী মনীষী ছিলেন; তাদের মধ্যে আহমদ নারাক্বী ও মোহাম্মাদ নারাক্বী সমধিক খ্যাত। অত্র গ্রন্থে পরবর্তীতে আয়াতুল্লাহ্ মোল্লা আহমদ নারাক্বীর মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে যা থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে - যিনি হিজরী ১১৮৫ সালে জন্মগ্রহণ ও ১২৪৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তার পুরো নাম আহমাদ বিন মাহদী বিন আবি যার আল- কাশানী। তিনি "ইজতিমা'উল আমরে ওয়ান্- নাহ্ই", "আসাসুল্ আহকাম্" প্রভৃতি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।- অনুবাদক

১০. আবদুল ফাত্তাহ্ বিন আলী আল- হুসাইনী আল- মারাগ্বী। ওফাত হিজরী ১২৭৪ সাল। তিনি আল- আনাভীন্, কিতাবুল্ বাই প্রভৃতি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। - অনুবাদক

১১. মোহাম্মাদ হোসেন বিন আবদুল করীম আন্- নায়ীনী। জন্ম ১২৭৭ ও ওফাত ১৩৫৫ হিজরী সাল। - অনুবাদক

১২. অনুসরণের কেন্দ্রবিন্দু তথা দ্বীনী বিষয়ে, বিশেষতঃ ফিকাহর ক্ষেত্রে যে প্রাজ্ঞ বহুদর্শী মুজতাহিদের অনুসরণ করা হয় তাকে মারজা- এ তাক্বলীদ (مرجع تقليد) বলা হয়। সাধারণ জনগণ আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে কাউকে মারজা- এ তাক্বলীদ হিসেবে গ্রহণ করে। কোনো মারজার ইন্তেকালের পরে তার অনুসারী আলেমগণ অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য কোনো আলেমের বা আলেমদের অনুসরণ করেন এবং জনগণও তাদেরই অনুসরণ করে। যেহেতু মারজা বেছে নেয়া হয় গুণাবলী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সেহেতু নতুন মারজা কদাচিৎ মরহূম মারজা'র শিষ্যদের মধ্য থেকে হন; সাধারণতঃ তারা পূর্ব থেকে মারজা হিসেবে আছেন এমন কারো অনুসরণ করেন বা এরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন নতুন কাউকে বেছে নেন। মারজার পদ উত্তরাধিকার ভিত্তিক নয়। - অনুবাদক

১৩. শিয়া মাযহাবের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মগোপনরত অবস্থা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত যাকে যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ আত্মগোপন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি হিজরী ২৬২ বা ২৬৫ সালে (সাত বা দশ বছর বয়সে) সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিষদৃষ্টি থেকে নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যান এবং তার মরহূম পিতা হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আ.)- এর চার জন বিশিষ্ট শিষ্যের মাধ্যমে শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রাখেন ও দিকনির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখেন। এ সময়টাকেই বলা হয় সংক্ষিপ্ত আত্মগোপনের যুগ। এ যুগের মেয়াদ ৭৪ বছর। উক্ত চার ব্যক্তির মধ্যকার সর্বশেষ ব্যক্তির ইন্তেকালের পর আর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে তার পরিচয় সহ চেনার মতো আর কোনো লোক অবশিষ্ট থাকে নি; এ সময় থেকেই তার দীর্ঘ আত্মগোপন যুগের সূচনা। - অনুবাদক

১৪. শেখ ছাদুক শিয়া মাযহাবের অনুসারী প্রাথমিক যুগের সর্বাধিক খ্যাতনামা মনীষীদের অন্যতম। তার ওফাত হিজরী ৩২৯ সালে তার পুরো নাম আবুল হাসান আলী বিন আল- হুসাইন্ বিন মূসা বিন বাবাভাইহ্। তার সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ হাদীছ সংকলন "মান্ লা ইয়াহযুরুল ফাক্বীহ্" । - অনুবাদক

১৫. আল্লামা জা'ফার বিন খাযার আল- জানাজী আন্- নাজাফী; কাশেফুল গ্বেত্বা' নামে সমধিক পরিচিত। ওফাত হিজরী ১২২৭ সাল। তার সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ "কাশেফুল গ্বেত্বায়ে 'আন্ খাফীয়াতে মুবহামাতেশ্ শারি'আতেল্ গ্বাররা' "। - অনুবাদক

১৬. মোহাম্মাদ বিন মোহাম্মাদ তাক্বী আত্- ত্বাবাত্বাবায়ী আন্- নাজাফী। তিনি বাহরুল্ 'উলূম্ নামে খ্যাত। ওফাত হিজরী ১৩২৬ সাল। - অনুবাদ

১৭. আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ হাসান মোদাররেস (জন্ম ১৮৭০ খৃস্টাব্দ) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার ইরানের শ্রেষ্ঠ আলেম ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি বৃটিশ এজেন্ট রেজা খানের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ কারণে রেজা খানের নির্দেশে তাকে নির্বাসিত ও পরে হত্যা করা হয় (১৯৩৮ খৃস্টাব্দ)। - অনুবাদক

১৮. ওফাত ১৯৬২ খৃস্টাব্দ। তিনি হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ)- এর অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র শিয়া জগতের কেন্দ্রীয় ধর্মীয় নেতা (মারজা- এ তাক্বলীদ) ছিলেন। - অনুবাদক

১৯. ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিককার শতাব্দী সমূহের শীর্ষস্থানীয় মনীষী ওলামায়ে কেরামকে "ওলামায়ে মোতক্বাদ্দেমীন্" (পূর্বসূরি ওলামা) এবং সম্প্রতিক দু'- এক শতাব্দী কালের শীর্ষস্থানীয় মনীষী ওলামায়ে কেরামকে "ওলামায়ে মোতাআখেখরীন্" (সাম্প্রতিক ওলামা) বলা হয়। - অনুবাদক

২০. আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ হাসান শীরাযী; মীর্যায়ে শীরাযী নামে সমধিক পরিচিত। তার জন্ম ইরানের শীরাযে। জীবনকাল ১৮১৪ থেকে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ। তিনি ইরাকের নাজাফের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতেন এবং শিয়া জগতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মারজা- এ তাক্বলীদ ছিলেন। ১৮৮৮ সালে ইরানের শাহ্ নাছিরুদ্দীন একটি বৃটিশ কোম্পানীকে ৫০ বছরের জন্য ইরানে তামাক উৎপাদন ও ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে চুক্তি সম্পাদন করলে আলেম সমাজের নেতৃত্বে জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং মীর্যায়ে শীরাযী উক্ত চুক্তির প্রেক্ষিতে তামাক সংশ্লিষ্ট সকল কাজকে হারাম বলে ফতোয়া দেন ও মওজুদ তামাক ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। জনগণ তার রায় অনুযায়ী কাজ করে। ফলে শাহ্ উক্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হন এবং এরপর মীর্যায়ে শীরাযীও তার ফতোয়ার কার্যকরিতার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। - অনুবাদ

২১. তাক্বলীদী বিষয় মানে অন্ধভাবে অনুসরণীয় বিষয়। অর্থাৎ এমন বিষয় যে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞত্ব অর্জন বা বিশেষজ্ঞের ওপর অন্ধভাবে আস্থা স্থাপন ব্যতীত কেবল বিচারবুদ্ধির (আক্বল্) দ্বারা সঠিক

ধারণায় উপনীত হওয়া বা করণীয় নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। আর যে বিষয়ে বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে গায়রে তাক্বলীদী; এরূপ ক্ষেত্রে অন্যের অন্ধ অনুসরণ সঙ্গত নয়। - অনুবাদক

২২. হুজ্জাত্ (حجة) মানে বিচারবুদ্ধির বা উদ্ধৃতিযোগ্য এমন দলীল যার পরে সংশ্লিষ্ট বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শ্রোতা বা পাঠকের মনে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকে না, তা সে শ্রোতা বা পাঠক বাহ্যিকভাবে তা গ্রহণ করুক বা না- ই করুক। বিশেষ করে শ্রোতা বা পাঠকের অবস্থা বিবেচনা করে এভাবে কোনো বিষয়কে প্রমাণ করাকে বলা হয় "এত্মামে হুজ্জাত্" (اتمام حجة - হুজ্জাত্ সম্পূর্ণকরণ)। - অনুবাদক

২৩. এখানে দ্বীনী মৌল নীতিমালার অন্যতম নবুওয়াত সংক্রান্ত আলোচনার একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে, তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত - এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে তাওহীদ ও আখেরাত সংক্রান্ত ধারণা এমন বিষয় যে, যে কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাতে উপনীত হয় (কার্যতঃ সে তা স্বীকার করুক বা না- ই করুক)। কিন্তু বিচারবুদ্ধির পক্ষে কোনো নবীর নবুওয়াতের সত্যতায় উপনীত হওয়া তার নিকট নবীর পরিচয় ও দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে কোনো ব্যক্তি নবীর নবুওয়াতের সত্যতায় উপনীত হতে না পারলে তার জন্য বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য। তাই বলা হয়েছে, যার কোনো নবী নেই, তার নবী 'আক্বল। এ কারণেই, কোরআন মজীদে আহলে নাজাত (পরকালীন মুক্তির অধিকারী) হওয়ার জন্য তাওহীদ ও আখেরাতে ঈমান পোষণ ও উত্তম কর্ম সম্পাদনকে শর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল- বাক্বারাহ্ ঃ ৬২), নবুওয়াতে মুহাম্মাদীতে ঈমানকে শর্ত করা হয় নি। কিন্তু যে ব্যক্তির নিকট নবীর নবী হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তার জন্যে নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তার অনুসরণ ব্যতীত মুক্তি পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কারণ, এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুনাফিক পর্যায়ভুক্ত। - অনুবাদক

২৪. এখানে হাদীছ বুঝানোই লক্ষ্য। - অনুবাদক

২৫. সমকালীন ইরানের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ । - অনুবাদক

২৬. তার পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আল- হাসান আল- হুর আল- 'আমুলী। তার জন্ম ১০৩২ ও ওফাত ১১০৪ হিজরী সালে। তার সংকলিত "ওয়াসালেুশ শীয়া" শিয়া মাযহাবের সর্বাধিক বিখ্যাত ও বহুল ব্যবহৃত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। - অনুবাদক

২৭. আয়াতুল্লাহ্ ইউসুফ ছানে'ঈ সমকালীন ইরানী মুজতাহিদগণের অন্যতম এবং কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক। তিনি ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানের এটর্নি জেনারেল হিসেবে বহু বছর দায়িত্ব পালন করেন। - অনুবাদক

২৮. আয়াতুল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ জাওয়াদী অমোলী কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক এবং সমকালীন ইরানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আরেফ, মুজতাহিদ মনীষী ও মুফাসসির। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ) তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র সহ যে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী অমোলী তার নেতৃত্ব দেন। - অনুবাদক

২৯. আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ্ ইয়াযদী সমকালীন ইরানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ মনীষী ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা, কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক এবং নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য। - অনুবাদক

৩০. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আর- রাযী আল- কুলাইনী। ওফাত হিজরী ৩২৮ সাল। তার সংকলিত "আল- কাফী ফীল্- হাদীছ্" শিয়া মাযহাবের সবচেয়ে বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ। - অনুবাদক

৩১. খাজা নাছিরুদ্দীন মোহাম্মাদ বিন মোহাম্মাদ আল- জাহরুদী। জন্ম ৫৯৭ ও ওফাত ৬৭৩ হিজরী সাল। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইতিহাসবিদ হিসেবেও তার খ্যাতি আছে। - অনুবাদক

৩২. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল- মুকাদ্দাস আরদেবিলী। ওফাত জিরী ৯৯৩ সাল। বহু গ্রন্থ প্রণেতা খ্যাতনামা মনীষী। - অনুবাদক

৩৩. আয়াতুল্লাহ্ মোরতাযা মোতাহহারী সমকালীন ইরানের সব চেয়ে বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর ঘনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের বছর খানেক পরে ১৯৮০ সালে মুনাফিকদের হাতে শহীদ হন। - অনুবাদক

৩৪. শেখ মুফীদ শিয়া মাযহাবের প্রথম যুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মনীষী। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইরশাদ"। - অনুবাদক

৩৫. পুরো নাম মুহাম্মাদ রেযা বিন আল- হাসান্ আল- হুসাইনী আল- হিল্লী আল- আ'রাজী। ওফাত হিজরী ১১৫১ সালে। তিনি শিয়া জগতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মনীষী ছিলেন। - অনুবাদক

৩৬. আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন জামালুদ্দীন মাক্কী আন্- নাবতী আল- জুজাইনী আশ্- শাহীদ আল- আমুলী। হিজরী ৭৮৬ সালে শহীদ হন। তিনি শিয়া মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় মনীষীদের অন্যতম এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। - অনুবাদক

৩৭. আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আবুল কাসেম খুয়ী - যিনি ইরাকের নাজাফে বসবাস ও সেখানকার দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতেন। সমকালীন শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণের অন্যতম। - অনুবাদ

৩৮. আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ হোসেন বিন মোহাম্মাদ আত্- তাবরীযী আল- ক্বাযী তাবাতাবায়ী। সমকালীন ইরানের সব চাইতে খ্যতনামা মুফাসসির। তার লেখা তাফসীর "আল- মীযান ফী তাফসীরেল কোরআন" অত্যন্ত সুপরিচিত। - অনুবাদক

৩৯. যেহেতু তিনি শিয়া মাযহাবের অনুসারী শ্রোতাদের সম্বোধন করে কথা বলছিলেন এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসন করতে চাচ্ছিলেন এ কারণে তিনি এভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তার এ কথার অর্থ কখনোই এ নয় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ আহলে সুন্নাতের বিষয় নয়। এটি যে আহলে সুন্নাতেরও বিষয় তথা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য বিষয় তা অনুবাদকের ভূমিকায় সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । - অনুবাদক

৪০. ইউসুফ বিন হাসান আল- মামেক্বানী এফেতখারী। তার অন্য বিখ্যত গ্রন্থ "ওয়াসিলাতুন্ নেজাহ্"। - অনুবাদক

৪১. বৃহত্তর সিরিয়ার প্রাচীন নাম যার মধ্যে বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দান অন্তর্ভুক্ত ছিলো। - অনুবাদক

৪২. সূরাহ্ আত্- তাওবাহ : ১২২।

৪৩. আয়াতুল্লাহ্ হোসেন আলী মোন্তাযেরীকে। - অনুবাদক

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা 2

ভূমিকা 6

ফকিহের নিরঙ্কুশ শাসন-কর্তৃত্বঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব 9

ফকিহের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের তাৎপর্য কী? 10

ফকীহ্ শাসক কি নির্বাচিত নাকি মনোনীত? 16

মানব সমাজের জন্য ফকিহদের নেতৃত্বের প্রয়োজন কেন? 22

বেলায়াতে ফকীহ্ কি ঐশী পদ, নাকি পার্থিব ও জনগণের দ্বারা নির্বাচনীয় পদ? . 27

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ফকিহ শাসক মাত্র একজন হওয়া জরুরী ? 32

ফকিহ শাসক কি বিশ্বের সকল দেশের সার্বিক পরিচালনায় সক্ষম? 36

বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব কি ইমাম খোমেইনীর (রহঃ) উদ্ভাবন 39

বেলায়াতে ফকীহ্ কি অনুসন্ধানীয়, নাকি অন্ধভাবে অনুসরণীয়? 44

বিচারবুদ্ধির দলীল কি বেলায়াতে ফকীহর যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম? 48

বেলায়াতে ফকীহ্ প্রমাণের উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল কী? 53

বেলায়াতে ফকীহ্ প্রশ্নে অতীত-বর্তমান আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি 63

অতীতে বিশেষজ্ঞ পরিষদ না থাকার কারণ কী? এর ভূমিকা কী? 75

ফকিহ শাসকের এখতিয়ার কি মা'ছূমগণের (আঃ) অনুরূপ? 84

মুজতাহিদ নন এমন বিশেষজ্ঞগণ কি বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য হতে পারেন? . . . 94

অন্ত্যটীকা 99